Nov 2016 issue

ঈশান কোন

ঈশানকোণ

নভেম্বর ২০১৬ হেমন্ত সংখ্যা, বাংলা সাহিত্যের একটি ওয়েবজিন

ভিজিট করুনঃ www.ishankon.com

সম্পাদকঃ সদানন্দ সিংহ

প্রকাশনের ঠিকানাঃ অভয়নগর, আগরতলা, পিন-৭৯৯০০৫

বাগুইহাটি, কোলকাতা, পিন-৭০০০৫৯

ইমেল ঠিকানাঃ singhasada@gmail.com

ডাক যোগাযোগঃ পদ্মা সিংহ

নন্দালয়, অভয় লেন, অভয়নগর, আগরতলা-৭৯৯০০৫

সূচিপত্র

কবিতা

নকুল রায়, বনানী ভট্টাচার্য, অরুণিমা চৌধুরী, দেবাশিস সাহা, তুষ্টি ভট্টাচার্য, উৎস রায় চৌধুরী, দিশারী মুখোপাধ্যায়, চয়ন ভৌমিক, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, উৎপল ত্রিবেদী, রুদ্রশংকর, নীপবীথি ভৌমিক, অরুণ কুমার দাস, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, চিরশ্রী দেবনাথ, আশুতোষ রানা, অঞ্জন বর্মণ, তৃষ্ণা বসাক, সুব্রত দেব, সন্তোষ রায়, সনজিৎ বণিক, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিত ভৌমিক, সুবিনয় দাশ, শুভেশ চৌধুরী, প্রণব বসুরায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী, বাপ্পা চক্রবর্তী, বিমল বণিক, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দিলীপ দাস, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা পাল, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ বণিক, সিদ্ধার্থ নাথ, প্রত্যুষ দেব, মাধব বণিক, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, অশোকানন্দ রায়বর্ধন, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, সদানন্দ সিংহ।

গল্প

দুলাল ঘোষ, অনুপ ভট্টাচার্য, নীহার চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য, সদানন্দ সিংহ।

গল্পাণু

যুগান্তর মিত্র, সদানন্দ সিংহ, ব্রতীন বসু।

মুক্তগদ্য

শুভেশ চৌধুরী, নকুল রায়, অরুণিমা চৌধুরী।

ছড়া

অরুণিমা চৌধুরী, শঙ্কর দেবনাথ, দেবীস্মিতা দেব।

নিবন্ধ

অশোকানন্দ রায়বর্ধন, সদানন্দ সিংহ।

অন্যান্য

মুখোমুখি, বইপত্র আলোচনা, লেখাজমা, সম্পাদকীয়। প্রচ্ছদঃ শর্মিষ্ঠা পাল।

সম্পাদকীয়

এক

ভূপেন হাজারিকার গান মনে পড়ে প্রায়সময়েই – মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আজ একটু ভাবা দরকার আমরা কতজন মানুষের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করি! অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কতজন প্রতিবাদ করি। সংখ্যাটা শূন্য বলে কোনদিন আমি ভাবিনা। কেউ কেউ অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করেন। প্রতিবাদও করেন কিছু। কিন্তু তার প্রতিবাদের ধরণটা সত্যিই প্রতিবাদ কিনা এ নিয়ে ধন্ধে পড়ি।

'আমি' নামক শব্দটি ইদানীং আইফেল টাওয়ার ছাড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু যে মাটির বৃক্ষমূলের কথা আজ কোথায় জানি হারিয়ে গেছে, তাকে খোঁজার দায়িত্ব, তাকে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব কার --- একথা কে ভাববে? সজীব বস্তুর প্রাণ আছে বলেই নড়াচড়ার উপস্থিতি। আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মস্তিষ্কজাত অভিব্যক্তি তারই বহিঃপ্রকাশ, যার অন্তিম পরিণতি মৃত্যু। তবু আমি দেখেছি বহু লোককে 'আমি' নামক শব্দটা কেন কুরে কুরে খেয়ে চলেছে!

দুই

আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঈশানকোণ করে আপনার কী কিছু লাভ হয়েছে? আসলে এসব প্রশ্নের জবাব থাকে না। এটা ঠিক যে আমার নিজের লেখার সময় অনেক কমে গেছে ঈশানকোণ করতে গিয়ে। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যেখানে লাভ-লোকসানের কথা চিন্তাতেও আসেনা। খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ঈশানকোণ বের করি। ত্রিশ বছর আগে সেই একই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আমি নিজের উদ্যোগে লিটিল ম্যাগাজিন বের করতাম। এখনো সেই একই উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করি। স্বর্গীয় তৃপ্তি পাই। কবি-লেখক-পাঠকের সমর্থন পেলে সেটা সার্থক হবে। ঈশানকোণ-এ এখন পর্যন্ত যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আগামী দিনেও তাঁরা সমর্থন জানিয়ে যাবেন।

গত অগাস্ট ২০১৬ সংখ্যার ঈশানকোণ যতজন দেখেছেন, তার এক শতাংশ লোকও মতামত জানান নি। জানিনা এবার উন্নতি হবে কিনা। তবু আশা রাখলাম।

তিন

কবিতার ডেস্কটপ ভিউ আর মোবাইল ভিউ-এর মধ্যে কিছু তফাৎ চলে আসবে যদি কবিতার লাইন একটু লম্বা হয়। মোবাইলের স্ক্রিন ছোট বলে কবিতার লাইন লম্বা হলে মোবাইল ভিউয়ে লাইনটা ভেঙ্গে নিচের লাইনে আলাদা লাইন হিসেবে দেখাবে। আবার ডেস্কটপ ভিউয়ে ঐ একই কবিতার লাইনটা এক লাইনেই দেখাবে। এটা নিয়ে কিছুই করার নেই আপাতত। আর অনেকে কলমের লেখা কবিতা পাঠিয়েছেন বলে হাতের লেখার অস্পটতার দরুন কোন অক্ষর বদলে গেছে কিনা জানিনা। লেখা সবসময় অভ্র বাংলায় লিখে DOC /DOCX ফরমেটে পাঠানোর জন্য আবার অনুরোধ রইল। লেখা ইমেলের বডিতেও লিখে পাঠাতে পারেন।

চার

এখন পর্যন্ত যাঁরা ঈশানকোণ-এ লিখেছেন তাঁরা ঈশানকোণ-এ সবসময়ের জন্যে আমন্ত্রিত বলে ধরে নেবেন এবং তাঁদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ সব সংখ্যার জন্যে লেখা পাঠাবেন। আর যাঁরা আগে লেখা পাঠান নি, লেখা পাঠানের জন্যে সবার প্রতি অনুরোধ রইলো। আগামী সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তে বেরুবে। এ পর্ব থেকে ই-বই প্রকাশ শুরু হলো। প্রথম ই-বই হিসেবে শুভেশ চৌধুরীর কবিতা সংকলন প্রকৃতি পুরুষ ঈশানকোণের সাথেই প্রকাশিত হলো। ডাউনলোডের লিংকে ক্লিক করলেই কবিতা সংকলনটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

HOME

কবিতা

সাইবার সংগীত নকুল রায়

১

কণ্ঠে তোমার পরস্বর,
যে-গান ভেসে আসে
সে তোমার ক্ষতবেদনা।

আজ যন্ত্রের মন্ত্রে বিবাহ
তোমাকে পাই না আর।

২

সারল্যে মূর্খতা ভালো
তবু সে অসহ্য নয়;
ভুল বানানে চিঠি আসতো
তবু অপেক্ষা উপেক্ষা ছিল না।
আজ কিন্তু বুদ্ধি করে
ফেসবুকে আমাকে ঠকালে।

৩

তোমার সিঁড়ির শুরু
আমার বুক থেকে।

তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ
আমাকে চাওয়ার মধ্যে।

পথ পথের খোঁজ দেয়,
আমি তোমার সঙ্গেই আছি।
কতটুকু উঠলে
সিঁড়ি গুণতে থাকো।

৪

কখনও অন্য মানুষ
নিজের হয় অনুভবে।

কখনও নিজের মনের মানুষ
অন্য মানুষের ছদ্মবেশে
ঢুকে পড়ে।

অনন্যতা এত সোজা নয়।

৫

অপমানের ভাষাতেও
অনুবাদ আপেক্ষিক।

সন্তান আমাদের শরীরের
তবু যেন মনে হয়
তাদের স্বার্থে
আমরা প্রাচীন।

৬

মাটির অধিকার সর্বজনীন,
আকাশের মতোই স্বাধীন।

পাখির ডানারও
যন্ত্রণা আছে, তাদের
বুকের ভাষায়ও ওম্ জাগে
শাবকের আশায়।
মাটি মানুষ পাখির অধিকার
আকাশের নিচে একই

৭

বহুদিনের পুরানো বাতাস
তবু কেন প্রতি বসন্তে
তোমাকে মনে পড়ে।

পথে কৃষ্ণচূড়া মাড়িয়ে
গেছে কত মিলিটারি ট্রাক

তোমার শতশুদ্ধ প্রার্থনায়ও
বিপ্লব আসেনি সত্তরের দশকে।

শবের মিছিলেও তুমি একা
আমাকে ভালোবেসে গেলে।

৮

মেঘের ভেতরে ফেসবুক ?
ফেলে এসেছি—

ভয় নেই, বৃষ্টির সুতো
বেয়ে মেঘের মেয়েকে
ঠিক বান্ধবীর মতো
নিয়ে নেমে আসবে তুমি।

৯

পাতালের কথা জানি না,
তবে পায়ের তালে তালে
পা চালিয়ে না-গেলে
এই দুর্যোগের রাতে
বাড়ি ফিরতে পারবো না।

আশ্চর্য !
পথে এক বাড়ি-হারানো
মাতালের সঙ্গে দেখা।

১০

গান এত শস্তা নয়;
মানুষ আসুক দলে-দলে
তখনই সাইবার সং

পল রোবসন জেগে
উঠলেই—
পুনর্বার সাইবার সং
সেম্ বোট ব্রাদার।

১১

শুধু পৃথিবীর নয়, মানুষের
অন্তরেও অন্তঃসলিলা নদী
বয়, দাঁড় টানে ইচ্ছাশক্তি
আজীবন।

মাঝে মাঝে প্রেমাসক্ত সাঁকো
ধরে পারাপার করি
গৃহস্থ-জীবন।

১২

অক্ষর পড়ে আছে দেখো
দুর্দিনে বেদনা জাগাতে;

সুখী অক্ষরগুলি মাঝে মাঝে
অলস ভঙ্গিতে কৃপা করে দেখে;
তাদেরই সুদিনে বেদনাময়

অক্ষরগুলি তখনও নির্ভীক
জ্বলে উঠতে জানে।

১৩

নিজের সঙ্গে কথা না-বলে
সঙ্গী বাছাই করা কঠিন।

তোমাকে পাওয়া আরও জটিল।
তোমাকে পাওয়া আরও জটিল।

আমার সঙ্গে আমার ঝগড়া
চিরদিনের; স্বার্থকে তবু
পরার্থে জড়ালে—
সবচেয়ে ভালো হতো,
তা-ও সম্ভব নয় জানি
নিজের সঙ্গে কথা না-বলে।

১৪

জীবন তার নিজস্ব নিয়মে
ইন্টারনেটে চলে;
আমি জীবনের দাস, অথচ
জীবন মৃত্যুর।
ভালোবেসে হাত শক্ত করে
ধরে বাঁচা উচিত;
বাঁচার উজ্জ্বলতার সময়েও
ভালোবাসা বিক্রি অনুচিত।

১৫

যখন মর্যাদার চেয়ে ওজনে
ভারী হয় লুণ্ঠিত দ্রব্যের;

যখন সম্মানের নিচে বয়ে
যায় মানুষ কেনা-বেচা;

যখন শরীরের চেয়ে দীর্ঘ
হয় কৃতিহীন ছায়ালোক;

তখনই জেগে ওঠে দ্রোহিতা।

HOME

গল্প

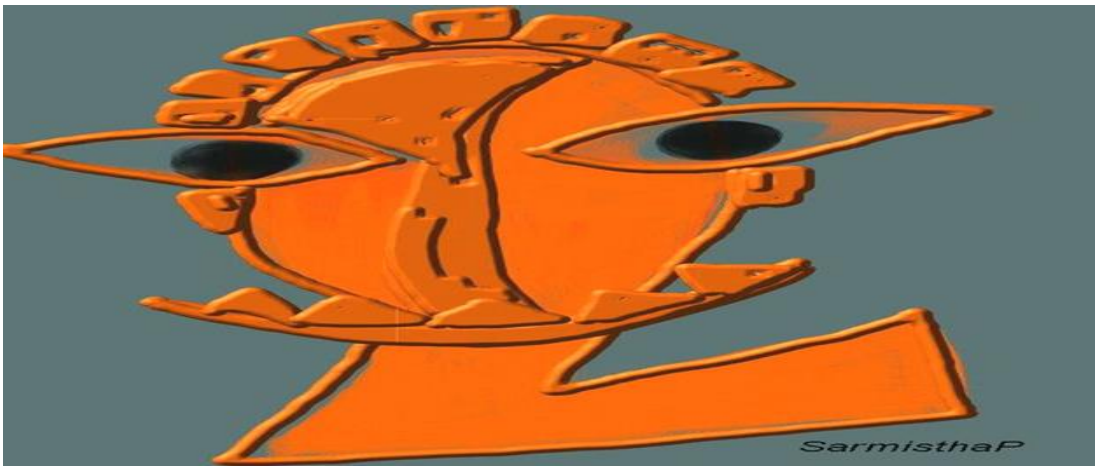

স্থাণু

দুলাল ঘোষ

একটা ছবি তুলে রাখো।

বন্ধ জানালার বাইরে বুড়ো শিউলি ফুলের গাছে, এক এক করে শেষ তিনটে সবুজ পাতার দু'টোই খসে পড়ছে যখন, ঘরের ভেতর বাতাস এক মহাশূন্যের নিচে, পায়ের নিচে মাটি না-পেয়ে শূন্যস্থিতি বুকে শুধু হৃৎপিণ্ড শব্দ করে। রক্ত ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়, এখন তক্তাপোষে কেবল শুয়ে থাকা—

একটা লাশ। বাইরে ভেতরে একই শব্দ শোনে --- শামুক ঠুকরে ঠুকরে খায় কয়টা পাখি। নিঃশ্বাসের গন্ধে মনে পড়ে মন্বন্তরের দিনে বদ্ধ-গোয়াল ঘরে পচে-গলে মরেছিলো বোধনী। এখনো মাটি স্পর্শ করে আছে কংকালসার, শূন্যদৃষ্টিতে শতশ্ছিদ্রে শরীরে সূর্যালোক ঢুকে যায়, আরোগ্যলাভের চেষ্টা করে সে, নিজের ছায়া দেখে নি কতোদিন তার মনে পড়ে।

--- এই লোকটার অবসাদ নিয়ে শিল্প গড়ে বহুরূপী। তীর্থংকরের চালচিত্র দেখায়, তীর্থংকর পাগল।

কতোটুকু পাগল হলে মুখ গড়িয়ে লালা ঝরে, পেটটা পিঠের সাথে একাকার হয়ে যায়। দীর্ঘ চুলদাড়িতে আবৃত চোখ। হায়নার মতো পলক পড়ে না। দীর্ঘকাল এই ঘরে শুয়ে আছে, লোকটা আসলে কে ?

নাটকের কোন চরিত্র হতে পারে ? তাহলে মঞ্চশয্যা হবে এই রকমঃ চোখ খুলে নড়বড়ে ঘর, চোখ বুজে অন্ধকারের শরীর ছিঁড়ে খুবলে পচা-গলা মাংসের মতো ইতিহাস জাবর কাটে। দীর্ঘকাল তক্তাপোষে শুয়ে শুয়েই একের পর এক আঁচড় কাটে মাটিতে। এক গাদা কেঁচো ঘরময় কিলবিল করে। ঘরময় ব্যাঙের রাজত্ব। এবং তেল চিটচিটে একটা সাপ তক্তাপোষ বেয়ে শুয়ে থাকা পুরুষটার যৌনাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় এখন। বাড়ি-রাখাল লোকটা দীর্ঘদিন একই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে।

বন্ধ দরজার বাইরে চৌকাঠে গা ঘেঁষে থাকে সড়াল্যা লালুও – ভক্ত লালমোহন বুড়ো হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে শব্দ শুনে মাঝে মাঝে পিচুটি জড়ানো চোখ খুলতে চেষ্টা করে, কষ্ট হয়, একবার লেজ নাড়ে, আবার একই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে।

সে ভাবতে থাকে, একদিন 'চরৈবেতি চরৈবতি' করে, আজ কেন মাটি ছুঁয়ে শুধু শুয়ে থাকা! প্রহর গোণা কেবল। ঘুম আসে না, উলটো সংখ্যা গুণে গুণে ক্রমান্বয়ে শূন্য যখন, স্মৃতি আসে।

কাঠের লাল-চুষণীটা চুষে চুষে, নীল মশারীর নিচে শুয়ে কেবল মশারী মশারী। ধাঁধার মাঝে ডানা-মেলা পরীর মুখ রামধনু রং ঝুনঝুনি লম্বালম্বি দোলনা দুলতো। ক্ষুধা লাগতো ক্ষুধা। চোখের কোণে জল গড়িয়ে জিহ্বায় লবণাক্ত স্বাদ লাগতো তখন – সোনা, সোনা আমার, ক্ষিদে পেয়েছে নাকি তোর! চাঁদ মুখটা শুকিয়ে গেছে বলে, জোর জবরদস্তিতে স্তনের বোঁটা মুখে পুরে দিলেই অস্বস্তি! হাত ছুঁড়ে পা ছুঁড়েও নিস্তার নেই – যতোক্ষণ না অবসাদ, আহা ঘুম! ঘুমের মাঝেও লাল-চুষণী আর পরীর মুখ ঝুনঝুনি লম্বালম্বি দোলনা দোলতো।

যে পেন্ডুলাম ঘড়িটা ঘরের দক্ষিণ দিকের পালায় দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো, দমবন্ধ, তারে দিন দুই আগে আধল ইট ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছে সে, অনর্থক যতো যন্ত্রপাতি। ভাঙা কাঁচে ডান হাতের তর্জনী কেটে গেছে অর্দ্ধেকটা, আঙুল চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ে। চোখ বুজে সে বুঝতে পারে এক দুই করে এমনি আপন শরীর ছেড়ে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাওয়া একদিন।

কোথায় যাওয়া ? সেখানেও কি এমনি দেয়াল ঘড়ি আছে ? দমবন্ধ ? জানালার বাইরে শিউলি ফুলের গাছে আজো একটি পাতা অবশিষ্ট আছে ভেবে আশ্বস্ত হয় সে। স্মৃতি হাতড়ায়।

একের পর এক আঁচড় কাটে মাটিতে। কান পেতে শোনে --- একটা শামুক ঠুকরে ঠুকরে খায় কয়টা পাখি, চেঁচামেচি করে—

তীর্থংকর..... তীর্থংকর.....
নিজেকে আরো গুটিয়ে নেয়! তবু খোলস ভাঙতে থাকে। শামুকের মজ্জা ও মেধা ঠুকরে ঠুকরে খায় .....
একটা কাক একদিন গুলতি ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিলো অনঙ্গ। অবশেষে অনঙ্গের কাছেই যাবে সে। বলবে, আমিও পালাইনি রে, আসলে বুড়িছুঁই খেলছিলাম নিজের সাথেই। কিছু কথা কাটাকাটি, ছবি আঁকিবুকি। যেমন, ভাঙা পেন্ডুলাম ঘড়ি ঘরে ঝুলতে থাকে বা একটা সাপ একজন পুরুষের যৌনাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় এমন।

দুই

তীর্থংকর, এইরকম ছবি তুলে মুছে ফেলে, তুমিও কি মনের ছবি তুলতে পারো ? কী চেয়েছিলে ?
একটা ঘর। ঘরে সোনামুখী সূচে আনন্দময়ী মা যদি নক্সিকাঁথা বুনতো! একজন অরুণকান্ত প্রাতঃকালীন প্রাণায়াম সেরে ঘুম ভাঙাতো --- তীর্থ, তীর্থ উঠো, প্রভাত-ফেরী যায় দেখো!
তুমি ছিলে কবি! অস্বীকার করেছিলে এপর্যন্ত জীবনের যত পচাগলা তত্ত্ব। ঘটনায় অঘটনে জীবন নয়। বলেছিলে,অনুভবে অনুভবে। লিখেছিলে, এতো দুঃখ যে কোন স্মৃতি নয়, কবিতা উচ্চারণের মতো জীবন এতো দুঃখ যে, সামান্য দীর্ঘশ্বাসেও একটা গল্প হয়! এতো দুঃখ যে কোন স্বপ্ন নয়, স্মৃতি নয় এখন, সন্তর্পণে সন্তরণে ব্যস্ত আছি --- কোন দুঃখ নয়।
তাহলে সুখ ? কী সুখের আশায় মন তুই গৃহীও না বাউলও না। একা একা বিচরণভূমে তীর্থংকর, তুমি একজন গৃহী ছিলে। সড়াল্যা লালুটা উপোস কাটাবে বলে ফিরে গেছে। ঘরের দাওয়ায়, ল্যাজ নাড়ে লালমোহন। তবু তোমার বুকে অনবরত বইতে থাকে --- ফেলে আসা শ্মশান ঘাটের কাছে ছোট্ট নদী, তার বুকে ঢেউ, রাতে পূর্ণ চাঁদও ভাঙতে থাকে। আর তুমি একা একা ---
ঘরে, তক্তাপোষে শুয়ে শুয়ে এখন কী ভাবছো ? ক্ষুধা ? রান্নাঘরের বেড়াল তোমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিলো ? ঘর তছনছ করেছিলো ? তোমার শরীরে শরীর ঘেঁষে আজও অনবরত ডেকে যায় দেখো ক্ষুধা। তুমি তারে কী শাস্তি দিতে পারো ? কোন ছবি তুলে রাখতে পারো ?

পারো না। এখন কিছুই পারো না তীর্থংকর! শত চেষ্টা করেও হাতটাকে মুষ্টিবদ্ধ করতে পারো না। তক্তাপোষে কেবল শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকো---
অনঙ্গ জানে না, প্রতিবার বীর্যপাতে কতশত মৃত্যু হয়! উল্কাপাতের মতো এই জন্ম, জীবন তুমি যাবে কোথায় ? নিশ্চিত গন্তব্যের কথা বলতে পারে একমাত্র তীর্থংকর, এখন একা একা –
তবু এই ঘরে রোজদিন তেত্রিশকোটি দেবতার পুতুল গড়ে সে, কার জন্যে ? একটাও ভাঙতে পারে না। আত্মহত্যা করতে পারে না তীর্থংকরের জন্যই। আরোগ্য চায়, বিপদভঞ্জন মধুসূদনের পুতুল বানায়!
আসলে পাগল হয়ে যায় সে উনিশ বছরের জন্মলগ্ন থেকেই! ফেরা রথের মেলায় বেলালী তার হাত ধরে নিয়ে যায়। বেলালী ষোল। কার্পাস তলায় মেলা বসেছিলো। কৃষ্ণনগরের পুতুল কতো সোহাগি ভাবতে থাকলে, অন্তঃসত্ত্বা বেলালী তার হাত ধরে নিয়ে যায় দূরে শহরপ্রান্তে।তিন কোনার মোকামে কালীফকিরার ঘরে সে ঢুকে গেলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ জানালা, দরজা, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিষপান করে বেলালী। বিবস্ত্রা হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকে, রক্তক্ষরণ হয় --- শাপমোচন। অনেক পরে, দরজা খুলে বেরিয়ে আসে যখন, একগাল হেসে বলেছিলো--- মেঘ কেটে গেছে।

তিন

এইসব দৈহিক না জৈবিক সুধা ? আমারে পাগল করে আসলে খড়কুটো, খুঁজে খুঁজে পাখির চঞ্চু থেকে যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা খসে পড়ে যায় সমুদ্রে, প্রতিবিম্ব দেখে অবশেষে ঝাঁপ দিলে --- চড়ুইভাতি করে মাছেরা, নিশ্চিন্তে সাঁতার কাটে। পিতৃপক্ষেও জলে কোনদিন তর্পণ করিনি, কারণ প্রতিবার বীর্যপাতে কতশত মৃত্যুর মাঝে এই জন্মেও শুধু একা একা – মরণের চিন্তা এবং আমারই নাভি থেকে জন্ম নিলো যে বেড়াল, রান্নাঘর তছনছ করে প্রদেশজুড়ে একা একা ডেকে যায়, অবশেষে যৌনাঙ্গ ছুঁয়ে থাকে --- কেন বেঁচে আছি ?
একটিমাত্র কবিতার জন্য ? যৌনরোগ নিঃসঙ্গ করে শুধু, একলা করে ছাড়ে। গেরস্থালি ভেতরেও চার দেয়ালের ঘর করে একা একা। দর্শকের ভূমিকায় অবশেষে কত একলা হয়ে যাওয়া অনঙ্গ জানে না! আমার এই একাকীত্বরে সম্ভ্রম করে যায় শালারাই পঙ্গু করেছে আমারে—

বিকর্ষণ করেছে বেলালী। সে চলে গেলে বুকে মেঘ জমেছিলো কয়দিন ? জাহাজ কোম্পানীর কর্মচারি আমার বাবা একদিন বেকার হয়ে গেলে নেশা ধরেছিলো, আতরের গন্ধ নিয়ে ফিরতো গভীর রাতে। আমারই জন্যে মায়ের সময় নষ্ট হয়ে যেতো – এই চিন্তায় কতটুকু দুঃখ আছে ? একজন নাবালিকারে নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে কেউ পাগল হয়ে যায় আমি বিশ্বাস করি না। আর একজন বন্ধুর চোখ থেকে সেই ফুল পাখি আর জোনাকির রহস্য জেনে, তিলে তিলে তারে হত্যা করেও আমি পাগল নই। --- এই আমি, অন্যরূপে তীর্থংকরের ছবি তুলে রাখো।

চার

এই রকম অসংলগ্ন চিন্তা। চিন্তার ভেতরে চিন্তায়, দ্বন্দ্বে তীর্থংকর পাগল হয়ে যায়।
একলা শুয়ে বসে এখন কী করে ? উঠে বসে তক্তপোষে। সর্পিল শির শির করে শরীর। সূর্যালোক বাঁচিয়ে হাঁপায়। তক্তাপোষে বসে বসেই ভাবতে থাকে দালানকোঠা, বাইরে বারান্দা, ফুলের বাগান অঙ্গনে। ভেতরে বিছানা থাকবে একটা, জলের কুঁজো, সে আর বেলালী। বেলালী ? নিশ্চয়ই বেলালী। ভাবতে ভাবতে একা তীর্থংকর, তীর্থংকর একা একা –
দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পায়ে পায়ে দক্ষিণের জানালা খুলে দেখে গ্রীষ্মের নদী। তীরে বসে তীর্থংকর বড়শি বায়। তার অজান্তেই এখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিঃশব্দে সাঁতার কাটে ডুবুরি। সেই যে সন্তর্পণে সন্তরণে ব্যস্ত থাকা --- একটা সুস্থ কবিতার জন্যে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে, তীর্থংকরের জন্যেই বড়ো মাছ খুঁজে বেড়ায় সে।
এবং কিছুই না পেয়ে একসময় মরণের চিন্তায় পাগল হয়ে যায় তীর্থংকর। কবে সেই ছেলেবেলায় গয়লাবাড়ির পাগল কুত্তাটা কামড়ে ছিলো, এখনো গা শির শির করে। অস্থির অস্থির করে ঘেমে উঠে শরীর। তীর্থংকর জলের কাছে দৌড়ে যায়, স্পর্শ করে, আকণ্ঠ পান করে লক্ষ্য করে আতংক। এবং এইভাবে একসময় পাগল হয়ে যায় সে, বন্ধ দরজাটা হাট খুলে ধরে –
আলো আর বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরে। সব এলোমেলো করে দেয়। ভাঙা পাতিলের তলানিতে এক মুষ্টি চাল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয় তেলাপোকা। মশামাছি ওড়াওড়ি করে হা-মুখে আর বুকে। বাতাস আর বাতাস! রক্ত চলাচল দ্রুততর হলে,

এখন আমার কোন অসুখ নেই বলে, যতোবারই উঠে দাঁড়াতে গেছি – ছুঁইতে পারে না, ছুঁইতে পারে না করে বুড়িছুঁই খেলে কারা ?

HOME

গল্প

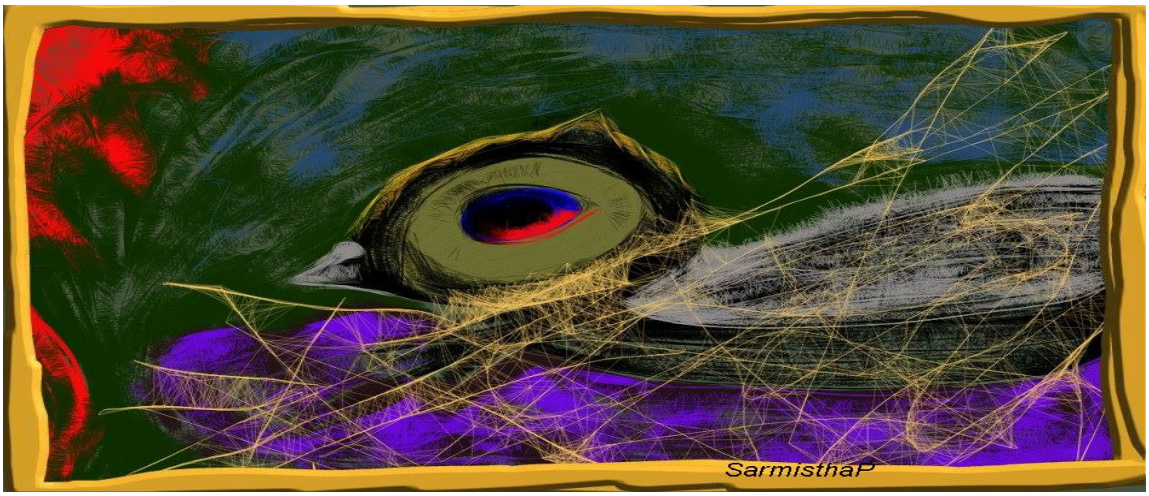

আত্মহত্যার আগে ও পরে

অনুপ ভট্টাচার্য

এক

ছেলেটি ভাবল, আমাকে নিপুণভাবে অভিনয় করতে হবে। সবাই তো পছন্দমতো এক একটা চরিত্রে অভিনয় করে সমাজে দিব্যি সাড়া ফেলে দিচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার মুহূর্তেও সে কিছু এরকমটা ভাবেনি।

পাশ করার পর চাকরির জন্যে তাকে বিভিন্ন শহরে ছুটতে হয়েছিল। শেষ নীট ফল মিলেছিল জিরো। তবে ছেলেটির মধ্যে এমন একটা স্মার্টনেস ছিল, তাকে বেকার বলে মনেই হত না। কাছেপিঠে যারাই চাকরি পেয়ে গেছিল, তাদের নিত্যদিনের আড্ডাকে সে নানান টেকনিকে জমিয়ে রাখত। তাকে দেখে তাজ্জব বনে যেত সবাই। বেকারত্বের কোন গ্লানি বা বেদনা --- কেউ ছেলেটির মধ্যে খুঁজে পেত না কোনদিন। তার ধোপদুরস্ত পোশাকআশাকে, ক্লিন শেভ আর দামি সিগারেটের প্যাক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোয় --- সবাই সহজেই তাকে বিশ্বাস করে ফেলল।

দুই

একদিন ছেলেটি একটি চা বাগানের ম্যানেজার পোস্টের জন্য ইন্টারভিউর ডাক পেল। সে তখন সবাইকে বলতে শুরু করল, আমি আসলে কোলাহল পছন্দ করি না। চা বাগানের নির্জনতা আমার বড় প্রিয়। আমি বোধহয় চা বাগানের ম্যানেজার হবার জন্যেই জন্মেছি।

এরপর থেকেই আড্ডায় হৈচৈ করতে করতে সে মাঝে মাঝে কিরকম আনমনা হয়ে যায়। আড্ডাপ্রিয় ছেলেটি একেকদিন এমন গুম মেরে থাকে, মনে হয় --- সে সেদিন তর্ক ও বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে থেকেও যেন নেই। তার নাকের ফুটো দুটো বেশ বড় হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে। চোখের চাউনি দূরমনস্ক হয়ে পড়ে। কপালে বেশ কয়েকটা চিন্তার রেখা ভেসে ওঠে। পোড়া সিগারেটের টুকরোয় অ্যাশট্রেটা ভরে যায়। কেউ তখন তাকে জ্বালাতন করে না। সবাই ভাবে এই মুহূর্তে সে নির্জনতা খুব বেশি পছন্দ করছে। তখন এভাবেই মাঝে মাঝে বিজন সময়ের কাছে চলে যায় সে। রোদজ্বলা দুপুর, শিশির পড়ার শব্দ বা আকস্মিক নেমে আসা সন্ধ্যা ছেলেটির খেয়াল ছুঁয়ে যায় না। কেউ কেউ ভাবে, এই সব মুহূর্তে কোনও সুন্দরী যুবতী তার মনের দখল কেড়ে নেয়। তার সঙ্গ অনুষঙ্গ ছেলেটি অদৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। তাকে লক্ষ্য করে সবাই তখন ফিসফিসিয়ে কথা বলে। তার এই জেগে ঘুমানোর অভ্যাস একান্ত কাছের মানুষটিকেও ব্যাঘাত ঘটায় না। অথচ কৌশলগত কারণে ছেলেটি এসব অভিনয় দিনের পর দিন চালিয়েই যায়। নির্জনতাপ্রিয় আখ্যায় আখ্যায়িত হতে চেয়েই এসব তার গোপন চাতুরী।

তিন

এর মাঝেই, দেখতে দেখতে একদিন চা বাগানের ম্যানেজারের ইন্টারভিউর দিন এসে গেল। ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হতেই সে আরো স্মার্ট হয়ে গেল নিমেষেই। পোশাকআশাকেও তাকে বেশ উঁচু দরের অভিজাত বলেই মনে হচ্ছে। সে এখন এরকম ভাবতে শুরু করেছে --- একদল লোক সুযোগ পেয়ে নানারকম প্রশ্ন করে রেগিং করবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ঠিক অনুরূপভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পরে পরেই উপরের ক্লাসের ছেলেরা তাকে নগ্ন করে নানারকম কুকর্মে ব্যস্ত করে ছেড়েছিল। অবশ্য সেই হার্ডলবার ছেলেটি সাসসিকতার সঙ্গে অতিক্রম করে এসেছে।

ইন্টারভিউ বোর্ড ছেলেটকে জিজ্ঞেস করল প্রথমেই --- তুমি অবসর সময় কাটাও কিভাবে ?

ছেলেটি চটপট উত্তর দিল, টেনিস খেলে, বিলিয়ার্ড খেলে, ছবি এঁকে। কখনোসখনো মদ খেয়ে।

--- চমৎকার চমৎকার।

চোখে চশমা, গলায় টাই, পাকা জুলফি এবার ভারিক্কি ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি তো আজন্ম শহরের ছেলে, চা বাগানের নির্জনতায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে তো ? কাজের বাইরে তোমাকে তো অন্য কোনো পরিবেশে মেলামেশা করা চলবে না। সে আন্তরিক গলায় জবাব দিল, ছবি আঁকা আর মদ্যপানের জন্যে নির্জনতাই বড্ড বেশি জরুরি। এবং আমার প্রথম পছন্দ।

বোর্ড মেম্বাররা একবাক্যে বলে উঠল, সাবাস। এরকম লোককেই আমাদের ম্যানেজমেন্টের খুবই প্রয়োজন।

সে এবার স্মার্টলি জিজ্ঞেস করল,আপনাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে ? সমস্বরে বোর্ড মেম্বাররা বলে উঠল, না। আমাদের যা প্রয়োজন আমরা জেনে ফেলেছি। সাতদিনের মধ্যে ইন্টারভিউর ফল তুমি জেনে যেতে পারবে। তৈরী থেকো—

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটি ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে বেরিয়ে এল। আসতে আসতে ভাবল, সত্যি সে আজ বেশ ভাল অভিনয় করতে পেরেছে। বোর্ডের সামনে সে আজ যা যা করতে পারে বলে স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছে, এর একটিতেও সে জীবনে সময় ব্যয় করে নি। তবে সে জানে চা বাগানের ম্যানেজার কিভাবে নিজস্ব সময়কে হত্যা করে এবং এও বুঝতে পেরেছে অনেক ইন্টারভিউতে সতর্কভাবে শক্ত শক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েও চাকরিটা ভাগ্য ফসকে অন্যের হাতে চলে গেছে। তার আগেও সবই জানা ছিল, একমাত্র অভিনয়টুকু নয়। এবার তার চাকরিটা না হয়ে যায় না। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সে। নিপুণ অভিনয়ে খুশি খুশি ভাবটা লুকিয়েও ফেলল আবার। চঞ্চল বালকের মতো রাস্তা থেকে পাথরের একটা টুকরো তুলে নিয়ে ফুটবলে লাথি মারার মত পা দিয়ে শট্ মেরে ফেলে দিল দূরে।

চার

সাতদিনের মাথাতেই ছেলেটার চাকরি হয়ে গেল। চাকরি হতে না হতে যেন বয়স্ক হয়ে গেল সে। দিব্যি এক রাশভারি স্বভাবের ভদ্রলোক। দায়িত্ববান, সম্ভ্রান্ত। কর্মদক্ষ।

এখনও সে সজ্ঞানে নির্জনতাপ্রিয় নিপুণ অভিনয় করে চলে। কখনো বা ঘন্টার পর ঘন্টা নির্জনতার দিকে চেয়ে থাকে। কখনো বা মদ খেয়ে নির্জনতায় সত্যি সত্যি একা একা মাতাল হয়ে যায়।

তখনই ছোটবেলাকার কথা বেশি বেশি মনে পড়ে। বৃষ্টির দিনে কাদা মেখে ফুটবল খেলা, ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরঘাটে ঘন্টার পর ঘন্টা দাপাদাপি করে সাঁতার কাটা। কালবৈশাখীতে ঝড় মাথায় করে আম কুড়ানোর কথা। সবই একে একে তার মনে পড়ে। বিশেষত মায়ের কথা মনে পড়ে, তার ভীষণ কষ্ট হয়। চাকরি পাওয়ার তিন মাসের মাথায় মা মারা যায়। মায়ের চেহারাটা আজকাল ভুলে যাচ্ছে কি ? ভীষণ ভয় হয় তার। চেহারাটা মনে মনে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। বেশিক্ষণ যেন পারেনা। ক্রমাগত দিনযাপন হয় তার নিরালায়। নিরালাই কোন কোন সময় শহরের বন্ধুদের স্মৃতি সামনে টেনে আনে। এলে খুব কষ্ট হয়। সে বহুদিন ধরে পাহাড়ের বেড়াজালে বড় বেশি কষ্ট পায়। ষাট মাস চাকরি জীবনে মাত্র তিন দিন শহরে গিয়ে তার বন্ধুদের সাথে দামি হোটেলে আড্ডা মেরে মদ খেয়ে রাত্রিযাপন করে এসেছে।

পাক্কা পনেরো বছর এভাবে দিনরাত্রি অভিনয় করতে করতে সে অভিনয়ে পুরোদস্তুর দক্ষ হয়ে গেল। এই দক্ষতাই তাকে আমূল বদলে দিল। শহুরে কেতাদুরস্ত ছেলেটি এখন একদম ভিন্ন প্রকৃতির। সে এখন সত্যি সত্যিই নির্জনতাপ্রিয় এক প্রকৃতিপ্রেমিক।

পঁচিশ বছর নির্জনতায় কাটিয়ে লোকটি একদিন অস্বাভাবিকভাবে মারা গেল। সবাই বলল, প্রকৃতি সত্যি সত্যি একজন নির্জনতাপ্রিয় প্রেমিককে হারাল।

পাঁচ

তার চাকরি পাওয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে সে ভীষণভাবে লোকালয়ে আসার তাড়া অনুভব করেছিল। হন্যে হয়ে শহরে চাকরির খোঁজও করেছিল। শেষ অব্দি হয়নি। হয়-ই নি।

আসলে সময়ের সঙ্গে সময় মেপে কোনোদিনই স্মার্ট হতে পারেনি ছেলেটা।

HOME

গল্প

এ কোন আঁধার

নীহার চক্রবর্তী

মহুয়া দত্ত । মহাদেবী উচ্চ বিদ্যালয়ের তরুণী শিক্ষিকা । স্টেশন থেকে স্কুল বেশ খানিকটা দূরে । তাই প্রতিদিন রিক্সায় চেপে স্কুলে আসতে হয় তাকে। আর তাকে স্কুলে নিয়ে আসা আর স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার মাসিক বরাত পেয়েছে মাধব হালদার । তরুণ রিক্সা চালক । কিভাবে ঘটে গেল মাধব এখনও ভাবে ।

মাধব সম্পর্কে মহুয়া কি ভাবে জানা যায়নি আজও । কিন্তু দিনের পর দিন তাকে টানতে টানতে মাধবের মনে অবাধ্য স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে । মাধব এও বোঝে তার মত প্রায় নিরক্ষর ও গরীব মানুষ মহুয়ার প্রেম পেতে পারে না, । তবে অপেক্ষা ক'রতে ক্ষতি কি । অনেকসময় মাধব মহুয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে । চোখের ভাষা বুঝতে চায় । কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না আজও । তবে মহুয়া মাধবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোনোদিন করেনি । চলতে চলতে নানা রকমের কথা হয় দুজনের মধ্যে । মাধবের বাড়ির খবর নেয় আগ্রহের সঙ্গে । মাধব খুব খুশী হয় তাতে । এই বা কম কি । নিশ্চয়য় আচমকা একদিন বসন্ত বাতাস ঢুকে যাবে মহুয়ার মনে ।

দিন যায়,মাস যায়, বছর যায় । তিন-তিনটে বছর পার । মহুয়া এখনও অবিবাহিতা । মাধবও বিয়ে-থা করেনি এখনও । তবে কি মহুয়া তার জন্য হৃদয়ে আসন পেতেছে ? হলেও হতে পারে ।

মাধবের বুকে নিটোল বিশ্বাস । কিন্তু আজও তো কিছু বোঝা গেল না । তাহলে কী হবে ? কোনোদিন হয়তো শুনবে মহুয়া দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে । রিক্সাও বদলে নিয়েছে । সইবে তার, ? সইবে ?

কয়েকদিন মহুয়ার দেখা নেই । খুব দুশ্চিন্তায় মাধব । কীভাবে তার খবর নেবে ? যার জন্য তার এত ভাবনা, তার ফোন নাম্বারটাও তার কাছে নেই । মাধব লজ্জায় চায়নি, । আর মহুয়াও সে কথা ভাবেনি । কিন্তু খোঁজ নেওয়া দরকার । আর যে ভাল লাগে না তার ।

শেষমেশ দুঃসংবাদ । ওই স্কুলের কেরানী সুশীল দে কাল মাধবকে জানিয়েছে মহুয়ার পাঁচ দিন আগে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে । অবাক মাধব । এ কখনো হ'তে পারে ? কেন এমন হ'ল ? কী হয়েছিলো তার ? কোন ব্যথা ছিল বুঝি বুকের গভীরে ? আর ভাবতে পারে না মাধব । হাউহাউ ক'রে কাঁদতে থাকে সুশীল দে'র সামনে । খুব অবাক হ'য় সুশীল । তারপর মাধবের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল,''জানি তো রে । তুই ওকে কতদিন ধ'রে নিয়ে এসেছিস । নিয়ে গেছিস । একটা মায়া তো হবেই । আমরাও খুব কষ্ট পেয়েছি ।''

হায়, সুশীল দে কী বুঝবে তুমি মাধবের অন্তরের দুর্জ্ঞেয় জগতের কথা । তোমরা দুঃখ পেয়েছ, আবার বেতন আর কাজের মাঝে হারিয়ে যাবে । কিন্তু মাধব প্রতিদিন কাঁদবে । সামনে নয়,নিভৃতে । খুঁজে দেখো তো সে জগত । খুঁজে পাবেই না ।

রিক্সাটা আর পথে চলে না। বাড়িতে রেখে দিয়েছে মাধব । জানি না কেন । পরজন্মে তার কি বিশ্বাস আছে ?

HOME

কবিতা

যুগলবন্দী বনানী ভট্টাচার্য

প্রতিটি সকালে মেলে ধরি
এক ক্ষয়িষ্ণু মানবশরীর
তিল তিল ক'রে গড়ে তুলেছি যে মনটাকে,
সে অবাধে প্রকাশিত হতে চাইলে
আর লজ্জা পায়না রক্তকণিকারা
এক আন্তরিক যুগলবন্দীর মূর্ছনায় আবিষ্ট থাকি দিনভর
আর কুর্নিশ জানাই ক্ষয়রোধকারী মস্তিষ্ককে
আরও একটি ভোর উপহার পাবার জন্য....

ঈশ্বরকে?
নিশ্চয়----
তিনি সর্বত্র, দেহে-মনে, জড় বা জীবে
তেমনই এ লেখার প্রতিটি শব্দে
প্রতিটি অনুভূতি জুড়ে
সর্বপ্রকার সন্ধানে, বা বন্ধনে
কোনো আনুগত্যের অপেক্ষা না রেখেই
অসীম--- অক্ষয়--- অনন্ত.....

পরিমাপ

বনানী ভট্টাচার্য

সঠিক দূরত্ব মেপে ভুলে যেতেই পারো
বাঁধন যখন উল্টো পাকে জড়িয়ে পড়ো,
আঁকড়ে ধরো, সম্পর্কটি আরো....!!

অহর্নিশি সম্ভাবনার আশঙ্কাতে ক্লিষ্ট
তখন জীবন অন্য বাঁকে
আপনমনে ভুল-ঠিকটুকু যথাবিধি বিশ্লিষ্ট....

সাজিয়ে নিয়ে সমান্তরাল অতীত-বর্তমান
না বলা কথার ভারে
পাতায় পাতায় শব্দেরা গাঁথে নতুন আখ্যান

জ্যামিতিক অঙ্কনে সরলরেখায় অগণিত বিন্দু
তেমনি আকাঙ্ক্ষাদের হারে
জলবিভাজিকা স্পষ্ট, তবু জেনো সেখানেই সিন্ধু....

HOME

কবিতা

মেন্টাল অ্যাসাইলাম ২

অরুণিমা চৌধুরী

বিবর্ণ শোকরঙ পাতা
পাগলাগারদের পথে ছড়ানো থাক
তিল যব ও গঙ্গাজল ছিটিয়ে
পিতৃপুরুষের সঙ্গে আমারও শ্রাদ্ধ হয় রোজ

প্রতিদিন ছায়াগুলো আরো একটু বেশি স্কিজোফ্রেনিক
হাতছানি দেয় 'চলো ঘুরে আসি'
চোখ বন্ধ হলে হারিয়েও যায়

আজকাল কবিতা লিখিনা
অলীক হাঁটুঝুল ছায়াদের কানেকানে বলি,
"ভালো থাকা বা না থাকাটা তেমন জরুরী নয়,যতোটা জরুরী মরে বেঁচে থাকা.."

কানামাছি

অরুণিমা চৌধুরী

দেখতে পাচ্ছিনা, তাই চোখ বন্ধ রেখেছি।
অথবা চোখেদের বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক।
চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে
পিছনের অনেক দূরবর্তী ছায়া দেখা যায়।
এসব দেখার মতো সময় হাতে কম।

চোখ বেঁধে নিলে হুল ফোটেনা
অথচ ভুলগুলো কানামাছি খেলার মতো
পুরোটাই অনুভবে বুঝে নেওয়া যায়
যান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে বদলে যাওয়া মুখ,
তোমাকে দেখলে ঘাতক মনে হয়,

দেখতে চাইনা, তাই বন্ধ রেখেছি চোখ।
দেখবোনা তাই মুঠো খুলে চোয়াল শিথিল,
ঘাড়ে চেপে বসা জোয়ালের ভার কিছুটা লাঘব

হে মৃত ভালবাসা!
শুধু ভুল অনুভবটুকু এখনো জীবিত।

HOME

কবিতা

হাঙর

দেবাশিস সাহা

বড় বড় দীর্ঘশ্বাস রঙের
ইউক্যালিপটাস গাছের মাঝে দাঁড়িয়ে
মা

ইট,কাঠ,পাথরে প্রাণ সঞ্চার করে
বিয়ে দিলেন,
সংসার সাজিয়ে
নাম দিলেন আশ্রম

আশ্রমের ভিতর অনেক আশ্রয়

গাছেরা এখানে ফল রাখে বাবার জন্য
পাখিদের মুখে মুখে চলে আসে আকাশ

আমার সঙ্গে সকাল-বিকাল
লুকোচুরি খেলে বাচ্চা বাচ্চা রোদ
ছায়াপিসি তো গরমকালে নিমগাছ

বড় বড় ফাটলের মাঝে
দিদি হলো কাটা ঘুড়ি
সারা শরীর জুড়ে মেঘ
চোখের উপত্যকায় বৃষ্টি উদ্যান

দিদির পিছুপিছু নানা রঙের অন্ধকার

হাঙরের মতো খেতে আসছে আশ্রমের আলো

বাবা
দেবাশিস সাহা

কাউকে না বলে
সদর দরোজা খোলা পেয়ে
জুতো না খুলেই ঘরে এলো মৃত্যু

বাবার সংগে কিছু কথা
শ্বাস বিনিময়

কাউকে কিছু না জানিয়ে
বাবা চলে গেলো মৃত্যুর হাত ধরে
নিয়ে গেলো আমাদের সবার পুজোর আনন্দ

আর নতুন জামার গন্ধ

বাবা চলে গেলো
থেকে গেল আমার ছেলেবেলা

বাবার হাতে রঙ করা ছেলেবেলায়
অনেক স্বপ্ন
অনেক বেলুন বাবার দশ আঙ্গুলে

সাদা কাপড়ের খন্ডে
আমি জড়িয়ে রেখেছি আত্মাজল

তারা হয়ে, ফুল হয়ে
গাছ হয়ে ঢেউ হয়ে
রক্ত- পুঁজ - লালা হয়ে
বাবা আমার কাছে রয়ে গেল

ছায়াহীন একটা শূন্যতা
আমার পথের দু-ধারে.....

আমি আর মা
থেকে গেলাম
বাবার চিহ্ন হয়ে

HOME

কবিতা

চৌবাচ্চা

তুষ্টি ভট্টাচার্য

পাটিগণিতের চৌবাচ্চা থেকে মাথা তুললে
ধারণার বাইরে থেকে যায় জল।
জল মানে খলবল
জল মানে ছলাৎ
জল মানে আকন্ঠ ডুবে যেতে যেতে
এক আঙুলের জেগে থাকা
আর ঘুমের পাইপ বেয়ে নেমে আসা
চৌবাচ্চার ভেতরে -
আর নিয়তি নির্ধারিত পাইপ বেয়ে যাওয়া .....

রকিং

তুষ্টি ভট্টাচার্য

যতটা জল হলে সাঁতার হয়
নৌকোয় তত ঢেউ ছিল না।
জিব্রাল্টার পাথর জেগে ছিল
ছইয়ের ভেতরে মাঝিও
ফেরি পারাপার হবে কি হবে না
এ সংশয় নিয়ে আসে নি কোন যাত্রী
ফলে মাঝি আর জিব্রাল্টার রকিং -
দৃশ্যত এদের কোন ভূমিকা রইল না।

কিছু অন্তত থাক

তুষ্টি ভট্টাচার্য

কোথাও কিছু একটা নেই –
এমন কিছু একটা, যার
নেই হয়ে যাওয়ার ফাঁকে
যেটুকু স্পেস ছিল, বা আছে
তেমনই কিছু একটা নেই।

একটা মুহূর্তর নেই হতে
এক মুহূর্তই লাগে।
অনেক স্পেস আর মুহূর্তর
পিঠে কিছু একটা থাকে।
কিছু একটা থাকার মত থাক অন্তত

না থাকার চেয়ে কিছু অন্তত থাক –
ওই জানলার চেয়েও ভারী কোন ফ্রেম
ওই আকাশের চেয়েও হালকা কিছু মেঘ
এই বৃষ্টির চেয়েও বেশি কিছু রিমঝিম -
থাক অন্তত কিছু।

মল্লার

তুষ্টি ভট্টাচার্য

এই বৃষ্টিতেই সব পাওনা বুঝে নিতে হবে
কোথায় মল্লার বিঁধে গেছে, কোথায় তেমন অবশ.....
বৃষ্টিমাখা ছুরির যে টুকরো গিঁথে আছে
উপড়ে দিয়ে চলে যাব আজ ভিজে ভিজে

পাওনা বুঝে নিতে হবে যে করেই হোক
একটা আধখাওয়া আপেল থেকে দূরে
যে গান পড়ে আছে
ফিরে যাব সেই সুরেলা সফরে

গেও না শ্রাবণ
গেও না এতবার গানের মত
শুনতে শুনতে গান হয়ে যাব

কিছু গল্প রেখে দিয়ে আষাঢ়ে মেঘ চলে গেছে
গান নেই, ছিল না কখনও।

HOME

কবিতা

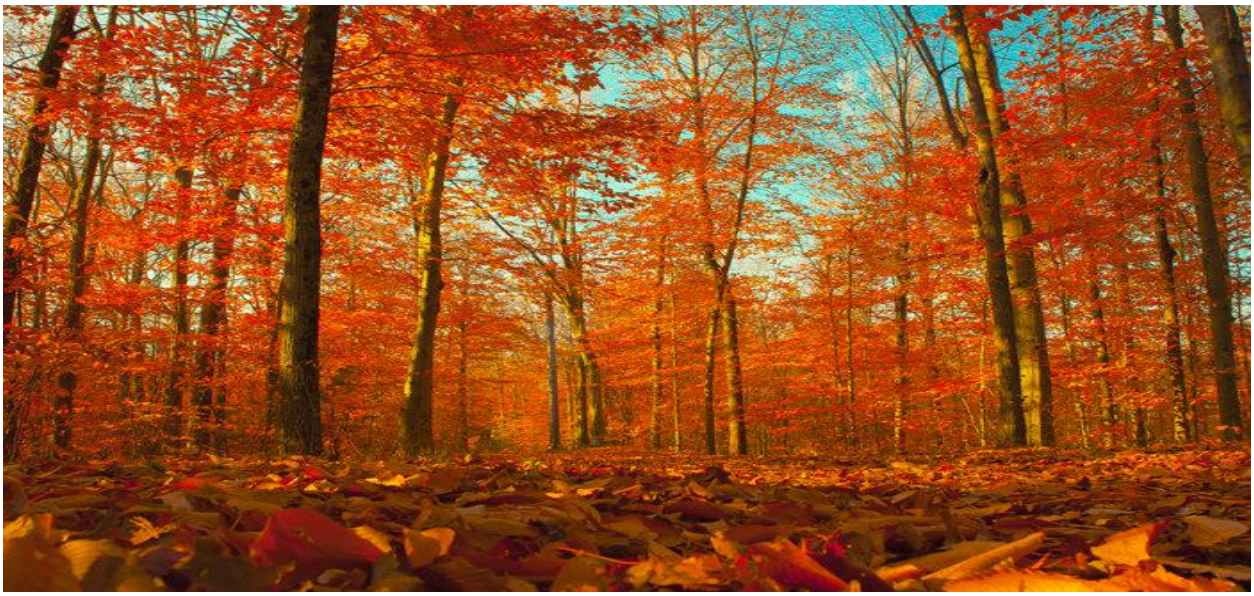

প্রথম পাতার পর

উৎস রায় চৌধুরী

এমন কিছু নেই যা দাগের মতো
ঘুণ ধরলেও উঠে যায় না, খ্যালে
প্রথম দিনের পর কয়েকদিন তারপর
শুরু হয় আলোকে নির্লোভ অন্ধকার
বিষ থেকে ভাষায় করার ক্ষীণ গান

এমন সবই সব বদলের পাড় রঙ
গুলিয়ে খেলে পড়ে থাকে খোলা চাঁদ
পীড়ের আদালতে যে পাতায় পাতা
তা কিছুই না শুধু সহজিয়া
মা শীতলার মতো আদুরে পাঁকে

সব জেনে গোলাপি হয়ে পড়ে থাকে

শেষ থেকে আবার প্রথমে এসে
প্রথম পাতার পর----------

পাস বাই

উৎস রায় চৌধুরী

রন্ধ্র পুষে রাখে দিনমান ছবি
ভুল ভুলেই যা মেপেছিলাম
দেখা হয় না অথবা হয় নিরুত্তাপ
অপ্রসংগত বেলা, ঝাপসা বালি

এসবের সাথে শুধু টুপ টুপ
পুরনো দীঘির গল্প
চেপে চেপে সইতে সইতে
ছিটকে চাকার দৌড় বিতান

আমরা দুই গোলকের তীর
কেমন দুমুখো হয়ে গেলাম

HOME

কবিতা

আচার্যের আশ্বাস

দিশারী মুখোপাধ্যায়

আমার সব রকমের সংযোগ কেটে দেওয়া হচ্ছে
কারণ আমি সংযোগগুলোকে আর একটু সংবেদনশীল করতে চেয়েছিলাম
আমি চাইনি একটা রাস্তা একজন পথিককে অন্য রাস্তায় পৌঁছে দিয়েই ঘরে ফিরে আসুক
আমি চেয়েছিলাম আলো অন্ধকারকে ভক্ষণ না করে তার ফিলামেন্টগুলোর রিপেয়ার করুক
যে মানুষটা কষ্ট পেতে পেতে পচা কুমড়োর মত ফেলা যাচ্ছে তার বীজগুলো সংগ্রহ করা হোক
আমি চেয়েছিলাম

সমস্ত রস নিংড়ে নেওয়া খেজুর গাছগুলোর সাংবিধানিক মিউজিয়াম হোক
তাই কি আমার সব সংযোগ কেটে দেওয়া হচ্ছে
আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু
আমার নীরব আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন
তিনি আবার গবেষণায় মগ্ন হয়েছেন
সংযোগ বিহীনতার একটি সংযোগ তিনি আবিষ্কার করবেন
এবং তাতে অ্যান্টি-কর্পোরেট সিস্টেম অপশন রাখবেন অতি অবশ্যই
তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন
রাস্তা,আলো এবং সংবিধান -- এ সবই তাদের আপন আপন ওয়্যারকে আপডেট
করবে আর মিতালি অক্ষুণ্ন রাখবে জলের সঙ্গে

মনের বেয়াড়ি

দিশারী মুখোপাধ্যায়

তুমি তোমার সমস্ত শরীর-মন থেকে যন্ত্রণার তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিচ্ছুরণ করে
ঢুকে পড়ছো তোমার নির্দ্ধারিত চেয়ার বলয়ে
সেইসব তেজস্ক্রিয় রশ্মিরা বিচ্ছুরণকে আরো বহুমাত্রিক ও উদ্দেশ্যমুখী করে
ছুটে আসে আমার দিকে
দশদিককে সহস্রদিক করে আমাকে বিদ্ধ করে
আমার সমস্ত প্রেমকে নিংড়ে বার করে নেওয়া হয়
ফেলে দেওয়া হয় আঁস্তাকুড়ে
আমার মৃত চোখ দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে
নষ্ট হচ্ছে আমার মুসাম্বির রস
তুমি তোমার পার্শোনাল ফাইল থেকে ঝেড়েমুছে ফেলে দিয়েছো
হলুদ কল্কে ফুলের সবটুকু মধু
মধু চুষে পান করার তোমার সেই ঠোঁট বেঁকিয়ে রেখেছো একটা অনিশ্চিত আমন্ত্রণের

দিকে
হয়তো সেখানে গড়ে উঠবে খুব উঁচু একটা গিরিখাত
সব যন্ত্রণাকে মন্থন করে
মাখন তুলে তুলে সঞ্চয় করে রাখছি দেখে
খুব বিস্মিতভাবে আমার তাকিয়ে আছেন শরশয্যার ভীষ্ম

আত্মশুদ্ধির শপথ

দিশারী মুখোপাধ্যায়

অনেকদিনের পুরোনো এক বন্ধুকে খুজে পেলাম
রাস্তায় অদ্ভুত রকমের একটা পাথর কুড়োতে গিয়ে

পাথরটি অনেক খেলিয়ে তবে আমাকে তার ডাঙায় তুললো
আর তার আপাত গোলাকার চেহারার মধ্যে অনেক রকম কৌণিক সম্ভাবনার তীর্যক ইঙ্গিত দিলো
আমি সেই পাথরের সঙ্গে তার ডেরায় গিয়ে উঠলাম
ডেরায় ঢুকতে প্রথমেই অবশ্য একবার মাথার চৌকাঠে ঠোকা খেলাম
বন্ধুবর পাথর আমাকে দেখিয়ে দিলেন
কিভাবে ফোল্ডিং পদ্ধতিতে বিনয়ের ব্যাকরণ রপ্ত করতে হয়

আমি সেই বন্ধুর সঙ্গে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে
আমার হাতের তালুতে থাকা সম্পূর্ণ জীবনকাল অনায়াসে খরচ করে আসি
পাথর-বন্ধুর সঙ্গী সাথী আরো অনেক ছোট-বড়, সাদা-কালো পাথরের সঙ্গে পরিচয় হয়
তাদের দেহ আর দেহের রসায়ন নিয়ে
একটা বড় রকমের পাথরপুরাণ লিখে ফেলার শপথ নিয়েছি
আশা করছি আমার বন্ধু আমাকেও রাস্তা থেকে তুলে এনে লাব-ডুবে আশ্রয় দেবে

আশ্রয় পেলেই আমি আমার সমস্ত পোশাক খুলে
রজকের বাড়ি ও তার ধোবিঘাট দর্শন করে আসবো নিশ্চিত

আমি ক্রমশ

দিশারী মুখোপাধ্যায়

রাত্রি গহন হতে হতে এইখানে এসে আরো রহস্যময়ী
এইখানে আমি একা সম্পূর্ণ আমিত্বটুকু নিয়ে খেলা করি
খেলার ভেতরে অনেক জল আর গোপনীয়তার প্রকাশ
অদৃশ্য বিন্দুর মত একটা জীবন অক্লান্ত দৌড়ে ব্যস্ত
বিন্দুটিকে অনন্ত ভেবে তার পরিধির এক প্রান্ত থেকে অন্যে

দিন যখন অনেকটা প্রকাশ্যে এসে অঙ্কের মত সরল জ্যামিতি
আমি তার জন্য দরোজা খোলা রাখি জাজিম সহ দরবারী
খোসা ছাড়ানোর কাজে বন্ধুদের সাহায্যের করি আমন্ত্রণ
কেয়ারি করা ভাবনার বিপুল ঐশ্বর্য ঘিরে উন্মাদনার লেখচিত্র
ধ্যানে বসে , খোসা বিহীন আমি তখন ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ওম-ম -ম

তবু নিজেকে বুঝে উঠতে পারছি না ,সে তো অনেক কঠিন
তুমি এখনো অপঠিত এক পাতাও আর যতিচিহ্ন তো অলীক
বসন্ত-বাহার বেয়ে একটু একটু করে আমি ক্রমশ রাত্রি
পাতুরির ভাঁজ খুলে ঢুকে যাচ্ছি আনন্দের দিকে যেরকম নদী

নির্মাণ

দিশারী মুখোপাধ্যায়

সঠিক আকারটা পেতে চেয়ে গড়তে গড়তে বেলা শেষ
গড়নটুকু শেষ হলো আপাতত
এরপর জায়গায় জায়গায় মাস বাড়বে কমবে

শাড়ির মত করে চলন
রঙ দেওয়া
চক্ষুদান

সব শেষ হলে ছুটি দাও সবেতন কী বিনাবেতন কুছপরোয়া
বানালাম যাকে সে আমাকে দেখেছে দুচোখে
তারপর রাস্তা চিৎপাত অথবা ঝপাং
তাতে পথিকের কাঁচকলা
লোটা কম্বল
পায়ে হাঁটা

আকার নিরাকার মহাপ্রস্থান মহাবিশ্ব কৃষ্ণগহ্বর

সংসার

দিশারী মুখোপাধ্যায়

আজ আমি পড়ে যাবো জানতাম না
একটু পড়ে মরে যাবো না কিনা কেউ জানে না

তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না - আমি বলি না
বাঁচা , না-বাঁচা আমার হাতে নেই
তুমি থাকলে আমার ক্যানভাস কথা বলে
এটা কোনো প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের কাছে গুরুত্বের বিষয় নয়
বিবেকও খুব ঘৃণা করে এ জাতীয় আমিষ-খবরে

পৃথিবীর অন্যপ্রান্তটি কখন শিলিগুড়ি কখন জেনিভা
খবর আসে না
নিত্যপ্রয়োজনীয় পাঁচটি সামগ্রীর জন্য এ্যাজেন্ডা নিয়ে
কিছু মানুষ পোস্টারে ব্যানারে বহুযুগ

হৃদয়টা এ্যাকচুয়ালি বুকে না মাথায়
পরিষ্কার করে জানা গেল না

আমি যখন এখানে পড়ে যাচ্ছি
তোমার তখন বাংলাদেশের ইলিশ,বেগুন ও কালোজিরে

HOME

কবিতা

ঢাকা - ৩০ শে জুন ২০১৬

চয়ন ভৌমিক

তারপর আর কিছুই বলার নেই আমার। শুধু মনে রাখুন আজকের মত অনুষ্ঠান শেষ। আর কোনো গান নেই, কোনো শিল্পী নেই তালিকায়। অপেক্ষাটাই এখন এক কারণহীন সময় নষ্ট, হে শ্রোতৃমণ্ডলী। বসে আছেন, জানি হয়তো মন ভরলোনা আপনাদের। যে সব বিনোদনের আশায়, প্রখর দুপুরের ঘাম মুছে এসেছিলেন আপনারা দূরদূরান্ত থেকে, তা হয়তো সার্থক হলো না এই তিনঘণ্টা ব্যাপী সুন্দর সন্ধ্যায়। কর্তৃপক্ষ আলো আর হাওয়া বন্ধ করে দেবেন এবার। আমাদের সীমাবদ্ধতার জন্য দুঃখিত আমরা, কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার উপায় নেই একদম। বিদায় নেওয়ার আগে কথা দিচ্ছি, যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে, আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। তখন আপনাদের হতাশ করবেনা আমাদের পরিকল্পনাহীনতা। শুধু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে কেড়ে নেবেনা আপনাদের উল্লাস করার দামী মুহূর্তটুকু। এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে পড়ুন না হয় আজকের মত।

আর, দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আগে, শুধু একবার বলি - ' ভালো থাকবেন সবাই'। আশাকরি আসছে বছর কাফেটেরিয়ায় গেলে, আপনাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেবেনা, মানুষখেকোদের আস্তিনে লুকানো নাশকতা আর সন্ত্রাসবাদ, এই আজকের মতো।বিদায়, নিশ্চিতে ঘুমাতে পারেন এবার আপনারা বাড়ি গিয়ে - 'শুভরাত্রি জীবিত মৃত সকলকে'।

পরজন্মের ঠিক আগে

চয়ন ভৌমিক

তবে শূন্য থেকে শুরু করি আবার। বন্ধ্যা জমিতে দাঁড়িয়ে, খুব দরকার বরাতটাকে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার। চিত্রগুপ্তের কাছ থেকে যে দূত এসেছিল, আজ ভোরে, তাকে মিষ্টি খাইয়ে, কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে বিদায় দিতে বেশ বেলা হয়ে গেল। সমস্ত সইসাবুদের পর, আমার হাতে এখন, আমার গতজন্মের সমস্ত পাপ ও ভুলের বিস্তর খতিয়ান। বেশ মোটাসোটা এই দস্তাবেজ পড়তে রাত কেটে যাবে মনে হয়। তবুও মন দিয়ে পড়ে এক এক করে পর্যালোচনা করে ফেলতে হবে সেই কালো তালিকার। যে মাশুল গুনেছি গতবার, এবার তা পুনরাবৃত্তির কোনো ইচ্ছাই নেই আমার। ডাক্তারবাবু জন্মাব আবার, কিন্তু নাড়ি কাটা বন্ধ থাক বরঞ্চ, আজ রাতের মত। আপনার ছুরি, কাঁচি, আর হাবিজাবি ওষুধপত্রের গন্ধ সরানো থাক আজ। একটু একা থাকা কাম্য এখন। আমার পুরোনো পালক, আমার অস্তিত্বহীন মুখোশ, আমার লুকানো আলমারির অন্ধকার চাবি থেকে, ধুলোটুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে, সমস্ত ভ্রষ্ট রিপু। প্রতিষেধক আর পুষ্টিকর খাবার কোথা থেকে আহরণ করা যায় ভাবতে হবে পরিজিনদের সাথে বসে। আবার সর্পদষ্ট হতে চাই না আমি, বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে চাইনা এক খুনী আসামীর মত। এইসব অপঘাতজনিত মৃত্যুর পর, বড় কষ্ট দ্যায় যমরাজের গরম কড়াই জানেনতো ভদ্রমহোদয়গণ। গরম তেলে ভাজে, আর তারপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দ্যায়, সাতজন্মের হাঘরে বিড়ালের মুখের ধারে-, যমরাজের পোষা কুত্তারা জানেনতো সূধীবৃন্দ। তাই এবার ঠিকানা ভুলের কোনো উপায়ই রাখবোনা আমি। সঠিক পথে হাঁটবো বলে মুচলেকা দিয়ে তবেই আবার ফিরতে পারছি আপনাদের দরবারে। আশা করি আত্মোপব্ধির পর পরজন্মে একটা শান্তিময় বিদায় পাওয়া যাবে। HOME

কবিতা

বজ্রকিশোরী

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

কোথায় চামেলিঘ্রাণ কোথায় জ্যোৎস্না
উড়ে গেছে মাঠঘাট বনাঞ্চল
এই অংশের দখল নিয়েছে বজ্রকিশোরী
তার কী দাপট
সাক্ষাৎ দুর্গামাতা

চুপচুপ পুকুরের জলে
ঘাই মারে পাকা রুই
জানালাদুয়ার খুলে মাতা একলা জেগে রই

এসো মাতা এসো তুমি
এসো নিয়ে প্রতীক্ষিত ঝড়

কেমন দেবতা

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

উল্লাসের কাছে নতজানু না হলে কেমন দেবতা তুমি,
প্রাচীন প্রকৃতিগত সুরায় মিশিয়েছি লাল সূর্যোদয়,
কলমীলতা ছুঁয়েছ তুমি,
ছুঁয়ে দেখ একান্ত নগ্ন শরীর।

শরীর এক পানসি তরী,
নিয়ে যায় গোপন বিলাসের ভ্রমণে
ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
কিছু কথা রেখে দেব যেমন চলে আসে।

শেষ যেবার ছুঁয়েছিলে,
রাহুমুক্তি বহুদিন পর,
আবার পাষাণ হব ছোঁয়া না পেলে,
শুরু হবে অহল্যা প্রতীক্ষা আমার।

HOME

কবিতা

প্রদোষ কাল

উৎপল ত্রিবেদী

তোমার করুণাসিন্ধু থেকে এক অঞ্জলি দ্বেষ চাইব বলে
আজো এই মাটির পাত্র হাতে বসে আছি--
অথচ তোমার দাহকর্ম হয়েছে দশ বছর আগে।
এখন আমার প্রায় ষাট হলো
এখনো নির্বিশেষে ভিখারির বেশ।

নদীতীরে খেলতে খেলতে আমার ভাইবোনেরা
আপনমনে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়
সমস্ত লালিমা ঝরে যায় মুখ থেকে
অথচ সূর্য রোজ আমারই অপ্রাপ্তবয়স্ক মুখ দেখে ওঠে
আর ডুবে গেলে এখনো তোমার মুখ অন্ধকার ।

কেউ কোথাও আর রইল না।
এক জাদু বিপন্নতায় পা রেখে পিতা

তাঁর বেড়ে ওঠা সন্ততিদের নিয়ে
কোথায় গেলেন এক বৃষ্টিময় পথে
আমি কখনো জানতেও পারিনি ।

আমি একা যক্ষ্মা হয়ে
কৃষ্ণের রথের বোকা ধনুর্ধর হয়ে
ভৌতিক রাত-নেকড়ের মতো
মাটির পাত্র নিয়ে বসে আছি, মা আমার,
এক অঞ্জলি দ্বেষ চাই বলে।

HOME

অমরত্ব

রুদ্রশংকর

এক বসন্তে চলে যাওয়ার সময় আমার প্রপিতামহ বলেছিল
ক্যানসার শুধু মৃত্যুর নয়, অসংখ্য জীবনের গল্প।
একসময় তার চতুরঙ্গ কল্পনায়
ঈশ্বরের কাছে অমরত্ব চেয়েছিল প্রপিতামহ,
সেদিন প্রকাশের চিরহরিৎ স্বপ্নে
অসম্ভবের সুতোয় ঝুলে থাকত অমরত্বের ধারালো ইচ্ছেগুলো।

আরও পরে স্কুলের দেওয়াল থেকে ক্ষতচিহ্নের মতো বেরিয়ে আসা ইট দেখে
ক্লাসের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থী হিসেবে জেনেছি
এই ইটের মতো অসংখ্য একক সাজিয়ে
তৈরি হয়েছে আমাদের ঘর, আমাদের শরীর।
আমি তখনও নিজের চোখে কোষ দেখিনি

তাই এপিঠ ওপিঠ করে মুখস্থ করতাম
শরীরের গঠনগত কার্যগত এককের নাম কোষ।
তারপর যখন বেকারত্ব নিয়ে প্রেমে পড়লাম
যখন মন থেকে মনের আসা যাওয়া চলতে থাকল
তখন এক একটা কোষকে মনে হত মননগত একক
আর কোষেরা আমার কাঠামোর অংশ,
কাজের অংশ, মনের অংশ পেয়ে ছড়িয়ে পড়ত দিগন্তে।

এ'ভাবে হিসেবের খাতায় নিজেকে বন্দি করতে করতে
অমরত্ব পেয়েছিল কোন এক মনযোগী কোষ,
অমরত্ব পেয়েছিল তার থেকে তৈরি হওয়া সমস্ত কোষেরা।
থাকতে থাকতে শুরু হল অহরহ খাবার জন্য লড়াই,
এক চিলতে জায়গার জন্য লড়াই।
আরও একটু সময় গড়ালে
আমার মতো প্রেমিক, আমার মতো লড়াই বিমুখ যারা
উপচে ওঠা অমরত্বে তারা ছড়িয়ে পড়ে অন্য কোথাও ,
সেই সঙ্গে দল বেঁধে তছনছ হয়ে যায় রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা
প্রকৃতির মতোই নীল অমরত্বকে রাখতে পারেনি শরীর।

HOME

কবিতা

নিষেধ

নীপবীথি ভৌমিক

ও বাড়িতে কোনোদিন পাখি বসেনি,
সারাদিন অযুত রহস্যাবৃত শান্ত মেঘদেশ
যেন ঘুমিয়ে থাকে বাড়ির দেওয়াল সাজিয়ে---
পোকামাকড়ও বসেছে কি কখনো?
হয়তো বা তাও না।
জানলারা যেন অসহায়।
অপরিচিত মুখ নিয়ে আড়াল তুলে রাখে নিজের সাথে নিজপথে;
নীরব অহংকারের ঘুম
সারাদিন বাড়ির দুই চোখ জুড়ে,
একদিন, ঝড়ের রাতে ঝড় হয়ে এসেছিলো
দাম্ভিক বাতাসঝড়,
শান্ত নীরব বাড়ি যেন অসহায় ঘুমন্ত চোখে বিঁধিয়ে ছিলো নিজেকে

তীক্ষ বিষের দহনে !
সকাল হতে দেখি বাড়ির সামনে হরিধ্বনি, উড়োখই-এর ওড়াওড়ি;
আজ পাখি বসেছে জানলার শার্সিতে।

ভাবনা

নীপবীথি ভৌমিক

তুমি ভাবতেই পারো, আমি অপরাধী
ভাবতেই পারো আমি কোনো বিত্তশালী অহংকৃতা
কিংবা সুন্দরী না হয়েও অপরূপা মুগ্ধময়ী,

দামী মার্সিডিজ আমার নাই বা থাকলো ,
নাই বা থাকলো বিদেশী কোনো সুগন্ধী স্নান...
তবুও তুমি ভাবো আমি সমৃদ্ধির শিখরে বিরাজমান ।

কিংবা নিদেনপক্ষে এভাবেও ভাবতেও পারো
আমি সর্বহারা, অসহায় বা কোনো এক চরিত্রহীনা অন্ধ গলির মেয়ে !

আসলে জানতো, ভাবনাটা শুধুই তোমার,
তোমার ব্যক্তিগত মূলধন।
তাকে সুদ আর আসলের খেলায় জিতিয়ে ক্রমশ বাড়িয়ে চলো তুমি সুদ-আসল
চলতেই পারো তুমি
সেটাও তোমার ব্যক্তিগত ।

তাই তুমি শুধু ভাবো, ভাবো,
আর ভাবনায় ডুবে থাকো
আমি চলি, চলি শুধুই চলি
নিজের মতো চলি নিজের পথে ।

HOME

কবিতা

কোলাজ

অরুণকুমার দাস

শেষ বলটি মাঠের বাইরে
ঈশ্বর উঠে এলেন, গ্যালারী ফাঁকা করে
পোহানোর আগুনে জল ঢেলে
রাত শুতে চলে যায়

শেষট্রেনের বাঁশি দাঁতন করতে করতে
কু - ঝিক - ঝিক -

আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঢুকে পড়ি
সমুদ্রগুপ্তের ঘোড়াটি শতাব্দী পার করে
আসল পরীক্ষাটি কাগজে - কলমের বাইরে

মাথা মাথা বিদ্রোহ জমা হচ্ছে

ঝড়জল ছাড়াই ছাতার আড়ালে বৃষ্টি
আমি মুখোশ খুলছিনা
ভাবাচ্ছে, একটি সাইকেল বেল বাজাচ্ছে

ভাবছি ঘুড়ি হব
ভাবছি বিনাটিকিটে ঘুরে আসার পর
বেঁচে যাওয়া টাকাটা কোন্ খাতে
জমা পড়বে ----

গিনিপিগ

অরুণকুমার দাস

বুকের খাঁচার উপর বায়োলজির খাতা
আমি সবজি বাগানে একটা দুটো টম্যাটো
তুলতেই ভুট্টাদের প্রবল উৎসাহ
পূর্বজন্মের অ্যাকোরিয়ামে ঢুকে
পাশবালিশ আঁকড়ে সাঁতার শিখছি
বীভৎস রোদ্দুর

সানস্ক্রিন মাখতে মাখতে স্বপ্নের মধ্যেই
গর্ভবতী

আর বায়োলজি নয়
কেমিস্ট্রি -
বারোমাস পার করে টুল দোলাচ্ছি

পৃথিবীর দোলনকাল শেখাতে এলেন ম্যাডাম
তিনি নিজেও মাঝে মাঝে দুলছেন

অনাবাদি ঘাসজমি ফেটে চৌচির

আমাদের কোচিং ক্লাসের বারান্দায় গিনিপিগ বাঁধা থাকে

HOME

কবিতা

২ সুখের কাছাকাছি কিছু লেখা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১.
মেঘের ইনবক্সে জমে উঠেছে চাঁদ
পোশাক পরছে আর ছাড়ছে
কে তাকে জলজন্ম দিল আখেরে
কার দৌলতে শুনে ফেলল রাণী ডাক
বউটি ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছে

২.
দরজা খুলে রাখি নুপূরের লোভে
মৃদু বাজনার ভিতর চৌকাঠের অঙ্গ ওঠে
সূর্যস্নানের পর তার ছড়ানো কেশে
ঢেকে যাচ্ছে জবাকুসুম পা

ভক্তি না আজকাল বড়ো যৌনকাতর
৩.
উঠোনে পড়ে আছে নরম ধানের দুধ ,
চরণ চিহ্ন আঁকা দুর্বাদল , পুরুষ্টু শাঁখ
আর অঙ্গরাগের চন্দন তবুও হলুদ
পাতা জড়ো হয়ে আছে এককোণে
পরমান্নের গন্ধ বিভোর পাখি ডাকছে

আমার প্রতিদিন ১২

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

সকালকে রোদের ভাবনা দিলে উপহার কিছু মেঘ নীলসাদা
সাদার ভিতরে কখনো পাহাড়
আবার গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ হয়ে যায়
এইসবের ভিতরে কেউ দোকান খোলে
রাখি ও স্বাধীন পতাকা
দুলে দুলে বিক্রি হয়
সূর্যাস্তের আগে কেউ অসহিষ্ণু নয়

আমার প্রতিদিন ১৩

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

শীতকাল এলেই পুড়ে যায় আমার বাবা ও মা
পুড়তে পুড়তে শীতল ঘরের ভিতর
দেখি সব কবিতার বই পোড়া অক্ষর মেখে

পাতা ঝরে যায় একের পর এক
আর আমি চিৎকার করে বলি
ও হেনরি আর পড়ব না
শেষ পাতা অবিশ্রান্ত শীতের বৃষ্টিতে
হাসতে থাকে
রক্তে ক্ষয় রোগ
বলতে পারি না দীর্ঘ বাঁচার কথা
বাড়ির পাশে কারা ডালে ডালে
আগুন দিয়েছে
পোড়া গন্ধ আসছে
আমি পুড়ছি ....

আমার প্রতিদিন ১৪

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

সূর্যাস্ত আঁকি
পাখির ডানায়
সমস্ত গুটিয়ে রাখি
তুলি ও সরঞ্জাম
সন্ধ্যায় আগস্ট এলো
চুলে চিরুণী ও ফিতে
বড়ো চুপচাপ
অক্ষর বসে যায়
আকাশের শূন্য খাতায়

ভাষার ভিতরে বাংলা
খুঁজে লেখে রাত্রি
তারা অসংখ্য তারা
মাঝে বাস শ্রীচন্দ্রবিন্দুর
ঘুমঘোর ঘর
স্বপ্নের রঙ নীল
তারপর ভোর ।

আমার প্রতিদিন ১৫

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

বিসর্জনে চলে গেছে সবাই ।
ফাঁকা চাতালে একা বসে আছি ।
কোথাও মা শব্দ নেই
অন্ধকার নিয়ে আছে সামান্য সিঁদুরের দাগ
খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে
কিন্তু চোখের কোণ শুকনো

পুরনো বাড়িতে ঢুকতে পারি না আর
শূন্য পড়ে মায়ের খাট , ঠাকুর ঘর , তুলসীতলা
শুধু কিছু ইঁদুর সম্পর্কের সূতো কাটতে ব্যস্ত
নতুনে অভ্যস্ত রিফু করার কথা ভুলে
কখন যে একা বুঝতে পারি না

নতুন বাড়ির একা ঘরে বিসর্জনের গন্ধ নিয়ে কিছু অপরাজিতা লতা
নিঃসঙ্গকে গান শোনায় ...

HOME

কবিতা

একা বিনোদিনী

চিরশ্রী দেবনাথ

বিহারি, মহেন্দ্র কাহাকেও আশেপাশে
দেখিতে পাইলাম না, তাহারা কেহই আমার নয়

আমি একা বিনোদিনী

সকালখানি দুইহাজার ষোল,

প্রায় একশত ষোল বছর আগেকার বালি মেয়ে এই শ্রী

ল্যাপটপ থেকে বেরোতে থাকে শুধু নিখাদ মধ্যরাত
বিষাদের মধু আমার শরীরে ফুটিয়ে দেয়
রোজকার অবাধ ঘাসবন
চারপাশে অশরীরী আমৃত্যু রবি
কতবার প্ল্যানচেটে ডেকেছি তোমায়
ধূপের ধোঁয়া, ফুলসাজ, পাতা খোলা সঞ্চয়িতা

কিশোরী মধ্যাহ্নের রবি বিলাস
পেন্সিলের সরু আঁচড়ে অস্পষ্ট হয়ে যে নাম
লিখিয়ে যেতো আঙুল
শিউরে ভাবি এ কি সত্যিই আমার রবি

সব মূহূর্তে আমি শুধুই বিনোদিনী
বিরহস্বাদ কিছুতেই মেটে না
প্রেম আমার বিলাসী শবগল্প, অহল্যা সময় ....
কালো পাথুরে মেয়ে
ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায় তোমার শুষ্ক খোয়াই
গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে প্রবল পদাবলী হয়ে কেবলি আমার জেগে থাকা,
এতো সব অপূর্ণতা তবু ভরে ওঠে রক্তের আনাচকানাচ
তীব্র ভাবে তাকিয়ে থাকা এক জোড়া সমুদ্র..

শীর্ণ খসখসে আঙুলে আঁকতে থাকি ঝাউবন
মাঝে মাঝে কেউ যেন বলে যেতে থাকে
টপোলজির জটিল সূত্র প্রমাণ, মেলাতে চাই না আর ...

সাদা নোটবুকে তারা এঁকে দিয়ে যাক
অ্যামিবা বিভাজন, দুফোঁটা হাসনুহানার বাতায়ন

আচ্ছন্ন ঘুমে অলিন্দ জুড়ে হাঁটতে থাকে বিনোদিনী
ঠোঁট কামড়ে থাকা কালবৈশাখীর গয়না মেয়ে ..

নাভি আর হৃদয়ের মাঝে যে জন্ম বেঁচে আছে
আমার সব স্নান সেখানেই .....
এ ঘোরের মতো সুখ আর নাই রবিকবি .....

HOME

কবিতা

সঞ্চরণশীল

আশুতোষ রানা

আমাকে আমার মতো হতে দাও
স্বচ্ছন্দ স্বাধীন চলাচলে---
যেরকম তোমাকে দিয়েছি
খোলামেলা সব।
কোনোকিছু না ঢেকেই ছাড়ো---
এ মাটিতে শুধু জলে বেঁচে আছি
সমাদরহীন--- অবিন্যস্ত মনে
আমাকে নেয়নি কেউ আজও।

তাই নিরুৎসবে পুড়ে মরে মন---
রাশি রাশি ছাই অনেকের কাছে ;
এ থাকা না থাকার মতো।

তবুও তো এই সত্তা কবিতা ফলায়
তাকে ভেবো না হে খুব সহজিয়া।

এই সোজা শীর্ণপথ বারে বারে
রুদ্ধ করে দেয় কেন সভ্যতা-সন্ত্রাসে?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নফলা সাহিত্যবলয় ধরে
সকলের সাথে মিলেমিশে থাকে।
তবু কেন বাদ সাধো পুরানো বিবাদে?

ছিন্নমূল তৃষ্ণার্ত প্রেমের নতুন প্রবাহে
যদি যাই কিছু করার উদ্দেশ্যে
চৈতন্যের মধ্যে ওঠে আলোড়ন---
তার থেকে রেখা-লেখা সমন্বয়-বিভাজনে
মূর্ত ও বিমূর্ত লক্ষ কবিতাশরীর।
আমিও তো ভাবসাগরে জলের ডুবুরি
থেকে রত্নের সন্ধানী একজন---
যদি পাই কিছু কাব্যরত্নকণা।

HOME

কবিতা

যারা চলে যায়

অঞ্জন বর্মন

যারা চলে যায় তাদের যেতে দিও। স্মৃতির সরণি জুড়ে সাজিও না মুখ। সময়কে ডেকে বোলো - সে কোনও প্রতারক নয়। বর্ষায় তো প্লাবন লাগে চেটাল নদীতেও।

উদ্ভিন্নযৌবনা মাটির কাছে ফিরে এসো হাতে নিয়ে বিশ্বস্ত লাঙল। রৌদ্র-জল-বাতাস মেখে কর্ষণে ভরে তোলো জমির উচ্ছ্বাস। ধানশীষে ঢেউ তুলে বাতাস সেও তো চলে যায়। জেনো, ফসলের স্তব্ধ অপেক্ষায় কোনও পাপ নেই।

কবিজন্ম, কবিমৃত্যু, কবির যন্ত্রণা – কিষাণের স্তব্ধতার অর্থ খুঁজে পায়?

HOME

কবিতা

অশরীরী

তৃষ্ণা বসাক

বরাবর আমি একাই হাঁটি, শরীরকে সঙ্গে নিই না,
নিলেও, একটুকরো হাড় ছুঁড়ে দিই দূরে,
শরীর লাফিয়ে যায় সেটা ধরতে,
সেই ফাঁকে আমি আর একটু এগিয়ে যাই,
উঁচু বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখি তৃতীয়ার চাঁদ...

চাঁদের নিচ দিয়ে গলে শরীর
আমার পায়ে পায়ে দৌড়ে আসে,
আমি এবার একটা লাল বল ছুঁড়ে দিই,
একটা ফ্রিসবি
একটুকরো মাংস
শেষপর্যন্ত নিজেকেই!

তারপর হাঁচোড় পাঁচোড় করে
ওর আদর থেকে বেরিয়ে এসে
হেঁটে যাই একা।

রৌদ্র স্নান

তৃষ্ণা বসাক

অতিকায় জলপাইয়ের মতো তোমার পুরুষাঙ্গ
দেখলেই আমার রৌদ্রস্নান করতে ইচ্ছে করে,
হেমন্তের ভোরগুলো যতটা ছায়াছন্ন
দুপুর ঠিক ততটাই তীব্র ও মায়াবী,
এমন দুপুরে
আমি শুখনো পাতা মাড়িয়ে প্রায়ই সমুদ্রের ধারে চলে যাই –
রামধনু রঙের মাছ
আমার পায়ে সুড়সুড়ি দেয়,
হেমন্তের দুপুর আমার স্তনের ওপর ঝুঁকে আসে,
পর পর বালির পাহাড়, বালির প্রাসাদ, বালির ক্যাসিনো...
একটার আড়াল থেকে তুমি বেরিয়ে আসো হঠাৎ নির্বসন!
অতিকায় জলপাইয়ের মতো তোমার পুরুষাঙ্গ—
আমি তেলে টুপটুপে হয়ে রৌদ্রস্নান করি।

এমনি এমনি

তৃষ্ণা বসাক

অনেকদিন ছাদে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজিনি,
অনেকদিন দেখিনি মুঠো মুঠো তারা ছড়ানো আকাশ,
অনেকদিন বাবার হাত শক্ত করে ধরে কোথাও যাইনি,

অনেকদিন পাশ ফিরে শুয়েও
মার বুকের গন্ধটা খুঁজে পাইনি,
এরকম নয়, যে এগুলো করতে না পেরে
আমার গলা দিয়ে ভাত নামছে না,
আমার প্রাণটা ছটফট করছে,
আমি মরে যাচ্ছি –

মরে অবশ্য আমি যাচ্ছি
কিন্তু সেটা ওপরের একটা কারণের জন্যেও নয়,
আমি একটা
বৃষ্টিহীন,
আকাশহীন,
বাবাহীন,
মাহীন
শহরে ঘুরতে ঘুরতে
আমি এমনি, জাস্ট এমনি এমনি মরে যাচ্ছি!

HOME

কবিতা

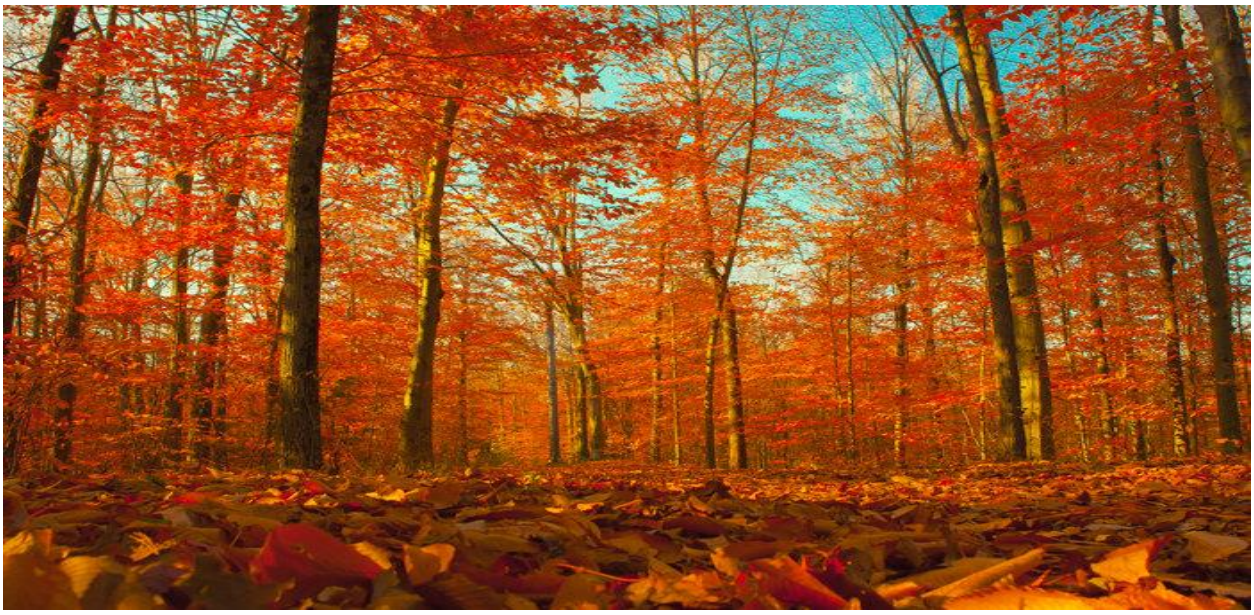

সুযোগ পেলেই

সুব্রত দেব

সুযোগ পেলেই আমি খুলে ফেলতে চাই।
খুলব বলে আমি তরে তরে বসে থাকি
রাতের পর রাত।
বিন্দুমাত্র সুযোগ আসে না তাই
হাত কামড়াই আমি
পা কামড়াই
কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করি সমস্ত শরীর।
দেখেও দেখে না কেউ, শুনেও শোনে না।
সবাই অন্ধ ও বধির সেজে বসে আছে আজ
ধড়িবাজ মালিক যেমন নাচায় তাদের, তেমনি নাচে!
কে বা কারা খুলে ফেলতে চায় তার দিকে সবার
কড়া নজর।

ইচ্ছে থাকলেও তাই খুলতে পারি না আজ
যদিও সুযোগ পেলেই আমি
খুলে ফেলতে চাই।

প্রার্থী

সুব্রত দেব

বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছি আমি।
ধুনি জ্বালিয়ে বসে থেকেছি দিনের পর দিন
ভুলেও কেউ ত্রিসীমানায় মাড়ায়নি।
এখন ঠিক করেছি, নিজে থেকেই যাব।
পর্বত মোহম্মদের কাছে না-গেলে
মোহম্মদকে তো পর্বতের কাছে যেতেই হবে।
তবে মাঝেমাঝে মনে হয়, কেনই বা যাব
আমার তো কোন প্রার্থনা নেই।
প্রার্থনার জন্য যারা বেঁচে থাকে
তাদের যেতে হয়।
কিছু পাক না পাক তারা যাক।
অন্ততঃ উচ্ছিষ্টটুকু তো কুটে খেতে পারে।
কিছু না-জোটার চেয়ে এও ভালো।
কে কখন আলো হাতে আসবে তার জন্য
শবরী প্রতীক্ষায় বসে থাকা অর্থহীন।
ঝুলির ভেতরকার বেড়াল সামলাতে
প্রত্যেকেই হিমসিম খাচ্ছে রাতদিন।
কীভাবে আসবে তবে
আর কেনই-বা আসতে যাবে আমার কাছে,
আমি তো প্রার্থী নই।

ক খ গ

সুব্রত দেব

ক, খ-র ওপর ক্ষুব্ধ; খ গ-র ওপর।
সবাই সবার ওপর ক্ষুব্ধ।
ক্ষুব্ধ বলেই কেউ নিজে থেকে কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে না।
নাড়ে না বলেই ইচ্ছাপুর এক্সপ্রেস
একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে
দিনের পর দিন
মাসের পর মাস
বছরের পর বছর।

HOME

কবিতা

অভিনয়

সন্তোষ রায়

একটি দিন থেকে বেরিয়ে এলাম যখন
চারপাশে করতালি
চেঁচিয়ে বলছে সবাই --- দারুণ অভিনয়
দারুণ অভিনয়।
হাসবো, না কাঁদবো ভেবে পেলাম না
সুয্যি তখন আলোকসম্পাত শেষে নির্বাপিত।

অন্ধকারে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত যখন
তখনো বলছে সবাই --- দারুণ অভিনয়
দারুণ অভিনয়

আমার সন্তান যখন জন্ম নিচ্ছে মাতৃজঠর থেকে
তখনো বলছে --- দারুণ অভিনয়

এখন খেতে গেলেও মনে হয় অভিনয়
ভালবাসলেও।
এমন কি মরে গেলেও মনে হয় মরিনি
আলো নিভলেই উঠে যাবো –

পক্ষপাতি নই

সন্তোষ রায়

সূর্য, চন্দ্র কোথায় জানি না
সাদাকাগজের পাশে অন্ধকার গলি
এখন গলির মুখে দাঁড়িয়ে
সত্য কথা বলার আগে
জীবনবীমা বাঞ্ছনীয়।

আমার বাবার নাম চন্দ্রনাথ
মা মহামায়া
দু-জনেই নির্ভয়-নির্ভয়া
আমিও বীমার পক্ষপাতি নই।

স্বল্প বেতনভোগী

সন্তোষ রায়

চলো পালা করে বাঁচি
তুমি তিনদিন, আমি তিনরাত্রি
যেমন একটিকে ভেঙেচুরে চা-খাই ক'জনে
যেমন পান্ডবেরা বিয়ে করে এক দ্রৌপদী

চলো পালা করে বাঁচি
তুমি তিনদিন, আমি তিনরাত্রি
যেমন একটি বেতন ভেঙে চার চাকুরী
নিরঙ্কুশ না হলে যেমন ছ'মাস-ছ'মাস মুখ্যমন্ত্রী
যেমন একটি সিগারেট খাই বন্ধু দু'জনে
সুখটান দিয়ে বলি, চলো পালা করে বাঁচি
তিনদিন বাঁচি আমি, মৃত তুমি তিনরাত্রি
তিনদিন বাঁচো তুমি, মৃত আমি তিনরাত্রি
স্বল্প বেতনভোগী –

নেই-আছে

সন্তোষ রায়

পাহাড়ে শিব থাকতেন একদা,
এখন নেই। গত হয়েছেন।
তাঁর নাতি-নাতনিদের নাম এখন –
রবার্ট, ফ্লোরিডা, বেঞ্জামিন...
দাদুর গায়ের চাম্‌সে গন্ধের সাথে
কিছু মিল আছে

শিবের সংসারে বটবৃক্ষ ছিল

নেশা-ভাঙ হ’ত।
এখন পরিত্যক্ত— জবাফুল পড়ে না পায়ে

শিব নেই
পাহাড়ে গাঁজা চাষ আছে—

তারা

সন্তোষ রায়

গাছ দেখি। তোমাকে দেখি না।
টঙ দেখি। তোমাকে দেখি না।
রিয়া দেখি। তোমাকে দেখি না।
বুকে বাঁধা চাঁদ দেখি
তোমাকে দেখি না।

সমস্ত খোঁজের শেষে
চোখ বুজে তোমাকেই দেখি
তোমাকেই দেখি

সংশয়

সন্তোষ রায়

ওই লৌহমানবটি নিদ্রায় কোমল হ’য়ে আছে
টিপে দেখো আত্মবিশ্বাস তুলতুলে
সচেতনতা নেই

তুমি তার নিদ্রার ভেতর দিয়ে যাও
স্বপ্নের কাছাকাছি গিয়ে বলো—
‘উই আর ইন দ্য সেইম বোট ব্রাদার’

দেখো চক্ষু খুলে কিনা
পাল তুলে কিনা
না-কি ডুবে আছে সুধাসাগরে!

সন্ধিবিচ্ছেদ

সন্তোষ রায়

সেফ্‌টিপিনের খোলা মুখে পা পড়লে
তোমার কথাই মনে পড়ে।
তখন, শ্রেণীর বেঞ্চে আমরা সন্ধিবদ্ধ হয়েই বসতাম।
এখন নিজেই পড়াই, দেখি দু’টি সারির
মাঝে আগের মতোই আছে চলার পথ।
হাঁটি। সূত্র আওড়াই।
কেউ সন্ধিবদ্ধ হ’তে চাইলে, মাঝখানে
দাঁড়াই,
বলি, বিচ্ছেদ করো পূর্ব-পর পদে।

পরিযায়ী

সন্তোষ রায়

চাকুরি ফুরোলেই ওরা চলে যায় কেন ডানা ঝেড়ে?
বুঝি বসন্ত শেষ

বুঝিবা শ্বাসকষ্ট বাড়ে
বুঝি কথা বলা বারণ
বুঝিবা ঋতুসব এম.এল.এ. হয়ে গেছে!
বুঝি দিনগুলি পাড়ার বখাটে-ছেলেদের সাথে মিশে গেছে
শিস দ্যায়
চোখ মারে
নাম ধরে ডাকে!
না হলে চাকুরি শেষ হলে ওরা চলে যায় কেন
কালাঝাড়ি
নীরমহল ছেড়ে?

HOME

কবিতা

অন্ততঃ এবার

সন্‌জিৎ বণিক

শুরু করা যাক মাঝখান থেকেই,
চুপচাপ যাঁরা এখনো বসে
এগিয়ে এসে বলুন দু'চার কথা,
স্বাভাবিক পরিস্থিতি জরুরি।

ভালমন্দের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলতে
সময় লাগে না বেশি,
আকাশের কথা ভেবে
মনের মাধুর্যের কথা ভেবে
যেসব ইচ্ছেনদী বহমান
তার দিকেই সবার ন'জর

সময়টা ভাল হয়ে উঠুক
হাতের স্পর্শে অন্ততঃ এবার।

ছাই

সন্‌জিৎ বণিক

ছাই ওড়িয়ে দেখো,
ভেতরে আগুনের গুঞ্জন, নীরব বিশ্বাস উত্তপ্ত।
ছাই ওড়িয়ে দেখো,
ছাইয়ের শূন্যবলয় কেমন জেগে রয় দিনরাত,
জ্যান্ত পোকামাকড়ের মতো।

কখনও জ্বলে ওঠে ভয়ের সাতলক্ষ ফণা,
কেমন উর্বশী চোখ টান্ টান্ প্রাণের প্রতিমা,
তোমার বুকের ভেতর জেগে রয়;
গাছে গাছে তখন পলাশের নেশা, রক্ত ভৈরবী
এক দুন্দুভী বাজিয়ে পা রাখে তোমার বুকের 'পর,
এর নামই ভালবাসা!
ছাই উড়িয়ে দেখো,
আর লিখে যাও ইতিহাসের কথা,
মানব জাতির ইতিহাস,
যাঁরা হাজার বছর শাসন করে এ জগৎ,
জংগল তছনছ করে ধ্বংস করে প্রাণবায়ু,
আর লিখে রাখে মিথ্যে সারাংশ এ পৃথিবীর!

এ দুঃখের দিন বদলে দেবার নামই কবিতা।

দীর্ঘজীবি প্রাণীদের কথা

সন্‌জিৎ বণিক

বিবেকের কথা ভুললে চলে ন,
চালিত শক্তির ভেতর এতো ঘুম,
সহ্য হয় না আর।
বারবার
উচ্চারণ করেছি দূর হ, দূর হ এ পথ থেকে,
শুনে নি তোর কা,
কেবল জড়িয়ে রেখেছিস গানের শিস।
গাছের পাতা ও সবুজ ঘাসেরা সূর্যতাপে আনন্দিত
উল্লসিত এই শীতঘুমের ভেতর,
সারাদিন শিরদাঁড়া সোজা রেখে করেছি প্রার্থনা
বিবেকের জানালায় রেখেছি চোখ,
হাজার শব্দের ভেতর কান জব্দ হতে হতে সেজেছে কালা,
এই পথে কন্টকাকীর্ণ দারুণ সময়;
অতিক্রম করে রেখেছি আমার বন্দনা,
মন্দ না এই সময়!
এই বালক
রোজ ভোরে দৌড়ে হাঁটে দিগন্তের দিকে,
সূর্য ওঠার আগেই
পথ শেষ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে,
জল খায়।
বিবেকের কথা মেনে চললে
জীবন যৌবন দীর্ঘজীবি হয়, বুঝেছি।

HOME

কবিতা

রুমাল ও সানগ্লাস

সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ের ওপর থেকে হাত নাড়ছো তুমি
নীচে, বহু নীচে
ফার্ন আর সেডারের বন পেরিয়ে
বয়ে চলেছে সরু ফিতের মত নদী –
স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ভিনদেশি রুমাল ও সানগ্লাস
ভ্যাকেশান – ঋতুর দিন ভেসে যাচ্ছে
পাহাড়ের ওপর থেকে তুমি ডাকছো –
পাখি ও পোকাদের মৃদু বার্তালাপ ছুঁয়ে

প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে
দেশে, মহাদেশে, কালো, স্থির, অন্ধকার পাড়ায়
একটা তারা এসে অন্য তারার ঠোঁটে
হাল্কা চুমু খেলে
আমি বুঝি, খাদ থেকে উঠে আসার সময় হল আবার
আবার পাহাড়ের ওপর মেঘজন্ম থেকে
তুমি হাত নাড়বে
নীচে, বহু নীচে
ফার্ন আর সেডারের ছায়া পেরিয়ে
সরু ফিতের মত নদী বেয়ে
বয়ে যাবে আমাদের রুমাল ও সানগ্লাস .....

HOME

কবিতা

চিঠি

সমিত ভৌমিক

মেঘ পিওনের হাতে দিলাম একটা চিঠি,
তোমার জন্যে।

মাঝরাতের ঘুম শহরে
পৌঁছে যাবে তোমার কাছে
তুমি জেগে থাকো।

বুকের কোণে লুকিয়ে রেখো ওই চিঠি,
সেইই ভালো।
প্রিয়জনের চোখ এড়িয়ে

খুলে দেখো মাঝে মাঝে
তোমার আমার প্রেমকাব্য।

অধিকার
সমিত ভৌমিক

অধিকার চাই, অধিকার
ভালো থাকার অধিকার, ভালোবাসার অধিকার।

সবটুকু নিয়েছ তোমরা
ভাব দিয়ে, তামাসা দিয়ে, ভয় দিয়ে
সবটুকু নিয়েছো কেড়ে।

এবার দাও ছেড়ে
কেবল থাকতে দাও আমার মত
আমার একলা ঘরে।

HOME

কবিতা

সমকক্ষ

সুবিনয় দাশ

পিছিয়ে রয়েছি তোমার থেকে, তুমি
কোলাহল জগৎ থেকে দূরে
শান্ত নদীর তীরে নিয়ে এলে আমাকে
আদর করলে মনে থাকার মত
জল কিছুই বলল না, শুধু দেখল
আমাদের দু'জনকে, মাতাল পাঞ্জাবিটি
পরে আমি ছবি তুললাম, খাওয়া দাওয়া করলাম
আর ঠাকুরদাস পাড়াতে গিয়ে আমি
সবাইকে বললাম এখন আমি তোমার সমকক্ষ

ব্যস্ততার ফাঁকে

সুবিনয় দাশ

ব্যস্ততার ফাঁকে তোমাকে কাছে ডাকলাম
সারি সারি সুপুরি গাছ তার শান্ত ছায়া
চলো যাবে নাকি ? বসবে কিছুক্ষণ তার নীচে ?
অনেকদিন পাশাপাশি বসি নাই, গল্পগুজবও
প্রায় বন্ধ, পাড়ার দোকানিরা কেউ আর
আড়চোখে তাকায় না আমাদের দিকে
কেউ শিশ দেয়না, স্ল্যাং শব্দ ব্যবহার করে না
এটা কি হল ? চারপাশটা এতো ফাঁকা
একটু শব্দ হলেই ভয় হয়, তুমি কাছে আছোতো ?

হঠাৎ

সুবিনয় দাশ

হঠাৎ তোমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে
আজ চোখে জল এল
মাসিমা কবিতা ভালোবাসেন তাকে
বসতে দাও, এলোমেলো শহরে এখন
এলোমেলো ঘুরছি, লম্বা ট্রাফিকে
দাঁড়িয়েছি কিছুক্ষণ, সামনের শ্রাবণে
মনসার ভাসানে আবার দেখা হবে
যদি ফ্লাইট আসতে দেরী হয়
মোবাইলতো আছে কথা বোলে সময় কাটাইও

যুদ্ধ

সুবিনয় দাশ

যুদ্ধ শুরু হবে আবার, তবে কবে শুরু হবে জানিনা
ময়লা নিতে আসা যুবকটিকে বলেছিলাম
তুমি না এলে কী হবে ? বসে আঁক
প্রতিযোগিতার বাচ্চারা গাছ লতাপাতার
ছবি আঁকছিল, এই পৃথিবীতে
মানুষের যেমন সুনাম আছে তেমনি
কলঙ্কও আছে, মহাপুরুষেরা পড়েছেন
মহাফাঁপরে, ধন্য আমি সে সবে কান
না দিয়ে নিজের মত ক্রোড়ে দুচার লাইন
কবিতা লিখছি, ব্যস

HOME

কবিতা

কর্পুর

শুভেশ চৌধুরী

মায়া উবিয়া যায় ডুবিয়া মরে রাই
অন্ধকার বাতাসে ভাসিয়া ওঠে সুর কালো আলো হয়
রস ভক্তি কাহার নাই শূন্যই ঐ সৃষ্টি
রাই কিশোরী রাত ও দিন পার্থক্য করে নাই

পক্ষ

শুভেশ চৌধুরী

বিরোধ আগুনের মত পুড়িয়ে ফেলতে পারে

গ্রাম শহর

বিরোধ ধ্বংস করেছে ট্রয়, হস্তিনাপুর
আজও তার তাপটি লাগছে শরীরে
দাঁড়িয়ে আছে দুই দিকে পক্ষটি ও বিপক্ষ দল

পুড়ছে আজ সিরিয়া সুদান
হত্যা, ধর্ষণ, লুট, ক্ষুধা
জীবন জীবন থেকে সরে যাচ্ছে দূর
ফুলের বাগানে আজ আগুন

বিরোধের কাছে পাঠাও আজ
বসন্ত শাদা পায়রা। বৃষ্টি ও শীতল পানীয়
পর্দা জুড়ে ভেসে আসুক লক্ষ শিশু
বৃদ্ধ, নারী, পীড়িতের মুখ
দূরে সরে যাক বন্দুকের নল

ভালবাস তুমি হাজার হাজার বছরের পৃথিবীকে
সভ্যতাকে, নদীকে, নারীকে, আকাশকে, নক্ষত্রকে
চোখে আসুক বৃষ্টির গান, ভিজে উঠুক মাটি
ভরে উঠুক শস্য আর ফসলে

পৃথিবীতে স্বপ্ন দেখাকে যারা নিষিদ্ধ করেছে
এর বিপরীতে
কলম ও তুলি ব্যবহার করে তারা
সুসময়ের এক বিশাল চিত্র এঁকে তুলেছে
তাই যুদ্ধ প্রাচীন ও নবীনে
কৌরব ও পাণ্ডবে

হাভাতে আর সর্বভুকে

অচলায়তনটিই সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে
তাই বাস্তিল ভাঙা হয়
ভাঙা হয় দানবের মুখ

থামাটাই মানুষের ভুল
চলাটাই ধর্ম
ঝড়েও ঘড়ি সময় বদলে দিয়ে যায়

HOME

মুক্তগদ্য

ভাবনা

শুভেশ চৌধুরী

তর্ক

আলোচনা থাক। সামনে খাবার, খিদেও আছে অনাবশ্যক কথার চালাচালি। আসুন বসি, খাবার গ্রহন করি।

বলুনতো কি নিয়ে কথা বলবেন। প্রশ্ন নয় অনুরোধ। আমরা সম্ভবত জানতে চাইছি বিষয় আর দেখতে চাইছি ওই বিষয়ের ভেতর নিজেকে। যদি নিজের সাথে দেখা না হয় আমরা অন্য কোথাও উপস্থিত আছি জানবেন।

সেবা আর সেবা নিবৃত যারা দুইজনই আমাদের মঙ্গলকারী। এইভাবে যারা আজ কথা বলছেন, গতকাল যারা কথা বলে গেছেন নিঃসংশয়, তারা পৃথিবীর কথক।
ভালো লাগছেনা কথা বলতে। মানুষের ভিতর আছে মানুষ চিরকাল। তর্ক নয়।

অফুরান

কখনো কি খিদে টা মরে গেছে মনে হয়, অনেকেই বলবেন বয়স হয়েছে চাগিয়ে উঠছেনা যন্ত্রের দাপাদাপি, রোগ ব্যথা ও স্থিমিত করেছে পাকস্থলীর মনোবেদনা।
মনটাও মরে গেছে বলবেনতো, কি আশ্চর্য পাখি ডাকল ডোপিং এর কাজ করলো বৃষ্টি, এল সেই উত্তেজক। খুকি আসলো মলিন বা উজ্জ্বল পোশাক চোখ দুটো জোড়া নক্ষত্রবিভা (সৌন্দর্য চুম্বক দেখেনি দেখেছে প্রজাপতির ওড়া যার ডানা ভাঙলে কোমায় চলে যান তিনি)।
ভাবছিলেন শক থেরাপি। সহ্য করা গ্রাহ্য এইসব, প্রকৃতি শুধু নারী নয় পুরুষও।
এমনকি যে জড় সেও শক্তি, মহামায়া।
হার কখনও ব্যক্তিগত নয় পদার্থের ধর্ম লুকায়িত রসায়নের জারণ সেইখানে উপস্থিত আর জীবন নাটকটির ওই পর্যায়, কুশ লব একটি সুখী গৃহকোণের ছবি আঁকছে।

বেতার

আজকাল হৃদয় কথা বলেনা, পরান ভোমরাও যথাযত সংবেদনশীল নয়, তাহলে কে সে সংযোগরক্ষাকারী তাহার সাথে বহির্বিশ্বের সাথে যার আছে নিত্য যোগাযোগ।
স্তিফেন হকিন্স ও অনেকের অভিমত নিকট কালে ছোট ছোট বিদ্যুৎ প্রবাহী তরঙ্গ আকাশে খুব দ্রুত সঞ্চারমান থাকবে আলোক বর্ষ থেকে আলোক বর্ষে তার পদপাত ঘটবে।
আমার অভিমত প্রাণীর মস্তিষ্কে উদ্ভিদের কোষে এমনকি জড় চেতনায়ও অনেক অনেক বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলা করে যা প্রতিনিয়ত তাঁদেরকে ব্রহ্মাণ্ডের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে চলে ও দূর ও নিকট একই সাথে, বুকে বসবাস করে। মনে হয় ইহাই আত্মা, প্রাণের গতি।

সম্পদ

সম্পদের সাথে ভাবাবেগের সম্পর্কটি নেই। প্রয়োজন, উপযোগিতা এইসব আছে। সম্পদ একটি চলমান বস্তু। পরিবর্তিত হয়, বিস্ফার এবং লয়ের মত তার নিত্যতা আছে।
অভিমুখ যদি বলা হয় মঙ্গলকারী তাহাতেই সম্পদ তার শক্তি ধরে রাখতে পারে।
প্রাণের উদ্ভব বিকাশ আজীবনের সদস্যপদ পাওয়া সব সম্পদ হতে আহরিত। ইহা পঞ্চভূতেরও অতিরিক্ত, শূন্যতা তার আর একটি আকর যাহা অনেকসময়ই দৃষ্টি বহির্ভূত।

জন্ম

অনিবার্য ঘটনাটি ঘটিয়া গেলে স্রোতের পক্ষেই সাঁতারটি চালাইয়া যান সকলে। অন্তরীক্ষের নিয়ম আর ঘাস কোনটাই তার ব্যতিক্রম নয়।
মূর্তটিতে হতচকিত হয় ভূমিষ্ঠ তারপরই মুঠোবন্ধ করে দৃঢ় হয় ইচ্ছা।
ইহা একটি যৌন ত্বরণ।
ছড়াইয়া পড়ে জন্ম পরিবারে যূথ আনন্দে।

রস

বস্তুবিন্যাস পদার্থবিদ্যা তাহার বন্ধন অনেক রস সমূহের অবস্থান। রস শুকাইয়া গেলে ঝর ঝর করিয়া কাঠামো ভাঙিয়া যায়। সেই মাত্রা যাহা এককে তাহা সমষ্টিতে।
এই রসের পরিমাণ গঠন বিশ্লেষণ কাঠামোটিকে বা কাঠামোসমূহকেও বন্ধন শেখায়। ইহা রসায়নবিদ্যা।
যদি বলেন রসের জীবন শুরু তাহা জীববিদ্যার বিষয়। সকল তারা তাহার মায়া স্নেহ।
একটু হাসিলে আয়ু বৃদ্ধি হল, রসের ধারা বহিল।

HOME

মুক্তগদ্য

বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি

নকুল রায়

বৃত্তি বা পেশা আপনাকে বাধ্য করছে আপনার এতদিনের অনুশীলিত চরিত্রধর্মকে বদলিয়ে দিতে। এতদিন ধরে জেনে আসছিলেন যে, সৎভাবে জীবনযাপন করার লক্ষ্যে আপনাকে সৎভাবে যে-অর্থ আসে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। একজন অশিক্ষিত, স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি অব্দি হয়তো পড়েছে, সে এসে আপনাকে জানালো 'চিন্তা কইরেন না, ছয়শ টাকা দেন, আমি গ্যাস আইনা দিমু'। বহুদিন লাইন ধরেও যখন অভিভাবক হিসেবে আপনি ব্যররথতার প্রমাণ দিলেন, ঠিক সেইসময়ই গিন্নি এসে বললেন 'দুইশ দিয়া দেও, তবু গ্যাস আইবো --- এই গরমে এমনিতেই প্রেসার বাড়ছে, তারমধ্যে তুমি খালি কও সৎভাবে সৎভাবে। সৎ আছেনি কেউ?'

সেই লোকটা গিন্নির কথাটি শুনলো, এবং আকর্ণ হাসি দিয়ে টাকা নিয়ে নিল। আর সত্যি বলতে কী, পরদিনই গ্যাস বাড়িতে এলো।স্বস্তি।

কিন্তু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন, সমাজে যারা সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, অথবা স্কুলেও যায়নি, তদের প্রতি মাসে যে-রোজগার; কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেও

আপনি চাকরি না পেয়ে এদিক-ওদিক খুচরো কাজ করছেন, এতে আপনার মনে হচ্ছে আপনার সম্মান বজায় থাকছে, আপনি দু-নম্বরি কোনো রোজগারের পথে জড়িত নন, আপনি ১৩ ঘন্টা রোজ পরিশ্রম করেও ওই সম্মান বাঁচানোর জন্য প্রতিদিনের 'মহান দারিদ্র্য' বহন করে যাচ্ছেন। অথচ যে লোকটা আপনাকে গ্যাস এনে দিল, খোঁজ নিয়ে জানলেন সে জায়গা কিনে দালান কোঠাবাড়ি করেছে; আর তাজ্জবের কথা (আপনার কাছে 'তাজ্জবই' মনে হবে, কারন আপনার মননে যে আদর্শ খেলা করে তা এতদিনে বস্তাপচা হয়ে গেছে) তার ১টি মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক সরকারি চাকুরেজীবীর সঙ্গে; এবং ছেলেটি চেন্নাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।

আপনার মোরালিটি আপনার কাছে—কথাটা বললো সেদিন আপনার এক বন্ধু। যে-বন্ধুটিকে আপনি দেখেছেন ছেলেবেলা থেকে। সেই বন্ধুটি দেড় লক্ষ ক্যাশ টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছে, তার দুটো ছেলেই বাইরে পড়ে, একজন ডাক্তার হবে অন্যজন ইলেক্ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার। আপনার বাবা ছিলেন গ্রামের স্কুল মাস্টার, স্বদেশী যুগের একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক সৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আপনি চোখের সামনে দেখেছেন কীভাবে যৌথ পরিবারগুলি ভাঙচুর হয়েছে স্বাধীনতার সময়। আপনার বাবা বড় ভাই হওয়াতে আপনার বাবার মা অর্থাৎ ঠাকুরমা আপনার বাবার হাত ধরে এপার ভারতবর্ষ ত্রিপুরায় এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল ভাই-বোন-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরিবারের সদস্যগণ। ক্রমে এ রাজ্যে জীবনসংগ্রামে লড়াই করতে করতে আপনার বাবা ও ঠাকুরমার মৃত্যু হলো। বর্ডার পেরোনোর সময় আপনার মতো একজন সেন্সেটিভ নাতির এক হাত ধরে এবং অন্য হাতে একটি মুড়ির টিন কোলে-কাঁখে করে এনেছিলেন। অজানা পথে ক্ষিধে পাবে নাতির ভেবে --- সেই দৃশ্যটি আপনার মনে পড়ে গেল আজ হঠাৎ করে, যে, ওই দুশো টাকা নিয়ে যে রান্নার গ্যাস সাপ্লাই করে দেয়, এবং এ করেই যে ছেলেমেয়ে মানুষ করছে, বাড়িঘর করছে, সে-ই তো আধুনিক মনের মানুষ। আপনি ভাবছেন, তাহলে আমি কী শিখলাম এতদিন এই পৃথিবীতে।

এসব ভেবে ক্লান্ত আপনি বাজারে ঢুকলেন। আপনার খালপারে ১৯৫৬ সালে বাবার কেনা বাড়ি। আপনার স্ত্রী ও দুই পুত্র। আপনার মানসম্মান আপনি বজায় রাখতে চান সৎভাবে অর্থ উপার্জন করে সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপনে। তাই দৈনিক ১২ ঘন্টা শ্রম করেও রাস্তার পাশে বসে যে সবজি বিক্রি করে প্রতিদিন সন্ধ্যে-সকাল, তার চেয়েও কম রোজগার আপনার। আপনার ছেলেরা পাস করে বসে আছে। দুজনেই সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। অথচ আপনি কোনোদিন কোনো রাজনীতি দলের সদস্য হতে পারলেন না, মিছিলেও যান নি

কোনোদিন, ভোট দিতেও যান না, বলেন কাকে দেবো পছন্দ হয় না; ব্যক্তি যখন দলের চেয়ে বড় হয় না, তবে এ রাজনীতি করে কী হবে, এসব আপনার মনের কথা, মনের দেশের মনের মতো আদর্শবাদ-বুলি। সুতরাং, আপনার দুই ছেলে এবারই ঠিক করেছে যে, সরকারি চাকরি না-করেও পৃথিবীতে বাঁচা যায় এবং মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহও বাঁচা যায়, এবং যথেষ্ট মান-সম্মান বজায় রেখেই।

কীভাবে ? প্রশ্নকর্তা আপনার বিবেক। উত্তরদাতা ওই দুই পুত্র। যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েও রাস্তার ধারে সবজি নিয়ে বসতে চায়; কিন্তু কখনই ওই ২০০ টাকা বেশি দিয়ে গ্যাস সিলিণ্ডার পাইয়ে দেয়ার ব্যবসাটা কখনই নয়।

এসব কথা মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে আপনি বাজারে ঢুকলেন। কিন্তু কিছুদিন আগেও আপনি ১০ টাকার নোট দিয়ে ৮ টাকার সবজি কিনে ২ টাকা ফেরৎ পেতেন। এখন বলা হয় --- 'মিলাইয়া নেন' অর্থাৎ ২ টাকা খুচরা নাই। অর্থাৎ ২ টাকা আপনি সব্জিওয়ালাকে দান করে যান অথবা আপনার দরকার নেই তবু আপনি ১০ টাকার পর ১৫ টাকা, নয় একেবারে ২০ টাকার সবজি নিতে হবে, কারণ ৫ টাকার কোন খুচরা নেই। না কিনলে যেতে পারেন আপনি, আমার বিক্রি করার কোনো ইচ্ছে নেই আপনার কাছে। এসব কথা আপনাকে বলতে হয়নি। ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয়ে গেছে। আপনি এসবের জটিল চক্রের ভেতর পড়ে গেলেন, এই অর্থনীতির গ্যাঁড়াকল থেকে রেহাই পাচ্ছেন না আপনি, বাড়তি টাকাও রোজগার করতে পারছেন না, --- তারপরেও আপনি ভেবে রেখেছেন আপনি সৎভাবে সৎ উপার্জনে জীবনযাপন করতে চান সপরিবারে।

অসম্ভব! আপনি মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছেন। মূর্খরা স্বর্গের বারান্দায় পৌঁছেই ডক্টরেট পায়, এটাও জানেন না? এরা কোনোদিন বলে না যে 'আমি কিছুই জানি না' – 'আমি মুস্কিল আসান, বলুন কী চাই, টাকা ঢালুন সব ব্যবস্থা হবে।'

আসলে ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে যারা ঘুরঘুর করে, এরা বিদ্যা ও জ্ঞানের পক্ষপাতী নয় আপনার মতো। একমাত্র রাজনীতির ক্ষমতাতেই এরা পরিচালিত হয়। যেমন ধরুন জীবনে কোনোদিন পড়াশোনা করেনি, ফেল থাকা ছাত্র --- একদিন রাজনীতির ব্যবসায় ঢুকে এমএলএ হয়ে গেল। এখন এই লোকটির ক্ষমতা হচ্ছে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেওয়া। খুবই মূল্যবান। আপনি কিংবা আপনার আদর্শবাদী ছেলেমেয়েরা হয়তো সে সার্টিফিকেট চাইবে না; কিন্তু আপনাকে কোনো না কোনো দলে নিতে চাইবে রাজনীতির ব্যবসায়ীরাই।

চট করে এদের মূর্খ বলা ঠিক হবে না। ঝুঁকি আছে আপনার। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতে পারে এরা। এদের লোকের যখন এসে ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢোকে, মনে রাখতে হবে এরা রাজনীতির ব্যবসা করে খায়; এদের মন জুগিয়ে না চললে আপনার ছেলে-মেয়েদের জন্যে কোনোদিন কোনো সরকারি সাহায্য পাবেন না, চাকরি পাবেন না, লোক পাবেন না, আপনার চোখের সামনে আপনার যুবতী মেয়েকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, এসব দেখেও আপনি গর্জাবেন না, আপনার প্রাণের ভয় আছে, আপনার সামনে তখন সব অন্ধকার; তখন আপনার সামনে কোনো আদর্শবান উকিল নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেই, দেশভক্ত নেই --- চতুর্দিকে শেয়ালের ও শকুনের চিৎকারের ভেতর আপনি তখনও ভাবছেন আপনি সৎ, সৎভাবে বেঁচে আছেন। শেষ শব্দটি ছুঁড়ে ফেললেন এই পৃথিবীতে, ভূমির উপরেই --- থুঃ।

HOME

মুক্তগদ্য

বুদ্‌বুদ

অরুণিমা চৌধুরী

ছোট বড়, কুলীন, গ্রামীণ, যেকোন মেলায় আর কিছু থাকুক না থাকুক, দেখবেন, ভীড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি, অবিরাম বুদ্‌বুদ উড়িয়ে যান।
মেলাচলতি মানুষের গায়ে মাথায়, মুখে সোহাগ বুলিয়ে, ছুঁইমুই বুদ্‌বুদগুলো কেমন ফুট ফুট করে ফেটে যায়!

প্রত্যেকটা বুদ্‌বুদের আলাদা আদল, আলাদা রূপ। মাথায় ঝলমলে সাত রঙের খেলা.., অথচ, বুদ্‌বুদওয়ালা কিন্তু কোনদিন কাউকে হেঁকেডেকে বুদ্‌বুদ বিক্রি করেন না, আমি অন্তত: দেখিনি।

আর, কোন জ্ঞান হওয়ার বয়েস থেকে এই বুদ্‌বুদের উপর আমার অনন্ত আকর্ষণ! কী বলবো আর! পুঁচকে এত্তোটুকু একটা কৌটো ভর্তি সাবান জল, আর একটা ফাঁদালো ফাঁপা কাঠি। মুশকিল হচ্ছে, বুদ্‌বুদওয়ালার মতো বড়ো বড়ো বুদ্‌বুদ অনেক চেষ্টাতেও তখন বানাতে পারতাম না, (এখনো পারবো না)। তারপর, সাবানজল সুরুৎ করে টানতে গিয়ে, ভেবলির মতো, প্রায়শই গিলে ফেলতাম।

তারপরের বিঘ্ন বিপত্তি. উঁউউউ..ডট ডট ডট..না বলাই ভালো। তাই, মাতৃদেবীর প্রতিবার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান উপেক্ষা করেও যদি খোঁট মেরে দাঁড়িয়ে, বায়না জুড়ে এক কৌটো জুটতো, বাড়ি আসা মাত্র, উপুড় হস্ত। সাবান জলের দফারফা। তখন, শ্যাম্পু গুলে হোমমেড দাওয়াই। তাতে আবার

বাড়িতে তৈরি ফুচকার মতো স্বাদহীন বুদ্‌বুদ। হয়তো, আমিই পারতাম না.. কিম্বা.. সেভাবে কিছুই বোধহয় ঠিক পেরে উঠিনা..।

তবে বুদ্‌বুদদের ভারি টান..এ আকর্ষণ আজও পিছু ছাড়লো কই!! সেবার বইমেলাতেও একপলক কি দেখলাম অনন্ত বুদ্‌বুদ রাশি! পা কি আটকে গেছিলো একবার হলেও!! এখন তো আর কেউ বারণ করবেনা। সাবানজল পেটে গিয়ে সর্বনাশ হবার তেমন ভয় নেই। তবু,..ইচ্ছে করে অমন অলৌকিক বুদ্‌বুদের মধ্যে হেঁট মুন্ড উর্দ্ধপদ হয়ে আবার জন্ম নিই, আবার ছুঁয়ে আসি জন্মান্তর..

ফেটে যাবে জেনেও,সাতরঙ মুকুটওয়ালা, ওহে, বুদ্‌বুদ স্বপ্নরাজি..আজও তো নিরন্তর ফুঁ দিয়েই চলেছি, দিয়েই চলেছি,যতক্ষণ না পুঁচকে কৌটোর সাবান জলের পুঁজি ফুরোয়..।

HOME

মুখোমুখি

এবারের কবি নকুল রায়

[কবি নকুল রায়কে অনেকেই বিস্তারিত চেনেন। সত্তর দশকের শেষদিক থেকে শুরু করে উনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস লিখছেন এবং এখনো অবিরাম লিখে চলেছেন। মূলত যদিও তিনি কবি, কিন্তু সবদিকেই তাঁর অবাধ বিচরণ। একসময় সীসার হরপের একটা ছাপাখানা চালাতেন। কালক্রমে এধরণের ছাপাখানার এখন অস্তিত্ব আর দেখিনা। লেখালেখির মাধ্যমে যা আয় হত, তা দিয়েই তিনি সংসার চালিয়েছেন। লেখা তাঁর নেশা আর পেশা। তবে আগরতলার মত ছোট্ট জায়গায় লিখে সংসার চালানো কেমন কঠিন ব্যাপার তা নকুল রায় ছাড়া আর কেউ জানে কিনা জানা নেই। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছাব্বিশ।]

প্রঃ লেখালেখির শুরুটা কীভাবে ?

উঃ ১৯৫৯-৬০ হবে, পঞ্চম শ্রেণিতে। রামনগর ৪নং জে বি স্কুলের ছাত্র। অশোক স্যার জানালেন পরের শনিবারে সাহিত্যসভা হবে না (তখন প্রতি শনিবার সাহিত্যসভা হতো), বর্ডার সংলগ্ন ইটখলার ধারে excursion-এ যেতে হবে।
গেলাম। যে-যার অভিজ্ঞতা খাতায় লিখে সোমবারে জমা দিতে হবে আশোক স্যারের কাছে।
সেই প্রথম একটি গদ্যের জন্ম হয় – কী লিখেছিলাম, আজ মনে নেই। তবে 'একটি গাছ খোলা মাঠে দিগন্তের দিকে হেলে আছে' এ-ধরনের কিছু হবে হয়তো একটি বাক্য, যা অশোক স্যার আমার পিঠে মৃদু চাপ দিয়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের সামনে বাহবা দিয়েছিলেন।
আর কবিতার জন্ম ? সে তো ১৯৬২ সালে যখন চিন-ভারতের যুদ্ধ শুরু হয় এবং শেষ হয়ে যায় দ্রুত। ৮ লাইনে যুদ্ধ বিষয়ক মাত্রাবৃত্তে একটি কবিতা লিখে কোনো এক শনিবার পাঠ করি। ৪নং রামনগর স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম স্বরচিত কবিতা এবং আমার জীবনেও।
তাছাড়াও, লেখা-দেখা-অনুভবের যোগ চলে ভেতরে; এর কোনো সঠিক দিন-তারিখ জানা থাকে না, প্রকাশ ঘটে মাত্র কোনো এক সময়, কিন্তু প্রস্তুতি তৈরিতে সাব-কনসাস্ বা অবচেতনক্রিয়া সর্বদাই সব লেখকদের পূর্বসূত্র হিসেবে কাজ করে। আর বাস্তবতার সংঘাতে, দ্বন্দ্বে লেখার ইচ্ছে থাকলে লেখার জন্ম হয়।
এভাবে শুরু হয়েছে।

প্রঃ নিজেকে নিয়ে কী ভাবেন ?
উঃ এখন, এই ৬৮ বছরের প্রায় শেষ; আগামী ১৯শে নভেম্বর ৬৯ বছরে পড়ব। এখনও, যেহেতু একটিও ক্লাসিক লেখা লিখতে পারিনি, তার সন্ধানে আছি। প্রতিদিন ভাবি, ভাবার অভ্যেসের ভেতর বেঁচে থাকি। একজন ব্যর্থ কৃষক আমাকে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বা বিষয় কী?' আমি কিছুমাত্র চিন্তা না করে উত্তরে জানালাম 'বেঁচে থাকাই আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, তা যতই বারবার ব্যর্থতায় আসুক না কেন'।
তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন 'ব্যর্থতায় ক্লান্ত হতে হতে যদি জীবন ফুরিয়ে যায়, তখন ?

বললাম ‘ফুরিয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে উঠতে হবে; কারণ আমার চারিদিকে বা পরিবারে বা সমাজে যেসকল মানুষেরা তখনও বাস করছে, তাদের কাছে আমার এই জ্বলে ওঠার মোক্ষম অস্ত্র একটাই --- সমস্ত প্রতিকূলতার ভেতরও আমার সততায় কোনো ফাঁকি ছিল না, তার দৃষ্টান্ত হিসেবেও আমি জ্বলে উঠতে চাই’।
তাই আমি সারাক্ষণ ভাবি। ভাবাই আমার নিত্যদিনের কাজ।

প্রঃ কী লিখেন এবং কেন লিখেন ?
উঃ কী লিখি --- এই প্রশ্নটির আগে আসে সেই মোক্ষম প্রশ্ন --- কেন লিখি। কেন লিখি? আমি না-লিখলে আপনি জানবেন কী করে যে আমি কেন লিখি, কী লিখি ?
যে তাড়নায় শব্দগুলো বাক্যে ভিড় করে, তাদের ছাড়া (শব্দগুলোর) আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই আমার বক্তব্যের। একটি কবিতা যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে সেই কবিতাটির কোনো বিকল্প শিল্প হয় না; না-কোনো উপন্যাস, না-কোনো গল্প, না-কোনো নাটকে সেই কবিতাটির যমজ সন্তান খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবিতা যখন লিখি তখন কবিতাই থাকে; কারণ কবিতা একমাত্র এমন জীবনশিল্প যার কোনো কারখানা নেই ক্লাস নেই এমনকি নিয়মিত ছাত্র পড়িয়ে ছাত্রদের কবিতা গিলিয়ে তাদের দ্বারা কবিতা-শিল্প সৃষ্টি করানো সম্ভব নয়। এ হল ভেতরের এমন এক অবারিত দরজার শব্দ যেখান থেকে মানুষের প্রবেশ ও প্রস্থান অতিসহজে ধরা পড়ে জাতকবিদের কাছে। তখন, সেইসব তাড়নায় শব্দগুলো বাক্যে ভিড় করে কবির কাছে। তখন তো লেখা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা আমার জানা নেই;
তাই লিখি।
এবং এসবই লিখি – বিরাটের ভেতর অতিক্ষুদ্র হলেও অন্তঃকরণের দিকে মুখ রাখলে যা মহৎ বলে মনে হয়।

প্রঃ জীবনের সাফল্য কিংবা ক্ষোভ, এ-বিষয়ে কবির ভাবনা এবং নিজস্ব বক্তব্য।
উঃ এতক্ষণ ধরে নিজস্ব বক্তব্যই বললাম।
‘জীবনের সাফল্য কিংবা ক্ষোভ, এ-বিষয়ে কবির ভাবনা’ কথাগুলোর প্রকৃত মানে কী বুঝলাম না। এই প্রশ্নটাই বিভ্রান্তিকর। জীবনের সাফল্য এক ধরনের আপেক্ষিক বিষয়, কেউ বহুভোগী সামান্যতে অরুচি; কারোর সাধারণ জীবনযাত্রা খুবই পছন্দ এবং মেরুদণ্ড

বিক্রি করার সনয় যদি কোনো মানুষ নিজেকে সাধু কিংবা সৎ বা সতী ভাবতে শুরু করে, এবং যথাযথ প্রাপ্তিযোগ নাহলে ক্ষোভ চলে আসে ব্যবহারিক জীবনে, তাহলে তার কবিতা লেখাও ছাইপাঁশ হবে, সে কবির নিজস্ব বক্তব্য যারা খুঁজতে চায় তারা আরেক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় করবে – এই প্রশ্নটাই অযথার্থ মনে হয়েছে।

প্রঃ মডার্ন, পোস্ট-মডার্ন, আফটার মডার্নিজম, নিও মডার্ন --- এভাবে কি সাহিত্যকে ভাগ করা যায়?

উঃ মহাভারতকে নিয়ে বিশেষ করে কয়েকটি প্রধান ও মুখ্য চরিত্রদের নিয়ে কবি বুদ্ধদেব বসু একটি ক্লাসিক গদ্যের বই 'মহাভারতের কথা' লিখেছেন সেই কবে --- আমি সাতের দশকের শেষদিকে পড়েছিলাম। সেই বইটি আগামী ১০০ বছর পরেও আধুনিক গদ্যের বই হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকবে --- তখনও বহুবার পণ্ডিতম্মন্য যারা সংসারে বিরাজ করবেন, তারা বলে যাবেন এই কুতর্ক-শব্দগুলি --- মডার্ন, পোস্ট-মডার্ন .....

যে সাহিত্য যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে, টিকে আছে --- তাই আধুনিক। আধুনিকীকরণে যাদের মুদ্রাদোষ প্রকট তারা যদি প্রতিভাশালী সৃষ্টির দোসর হন, তবে তো ভালোই, অন্তত সেই বিখ্যাত উক্তি আইনস্টাইনের 'সত্য জানতে-পাওয়ার চেয়ে সত্যের অনুসন্ধানই শ্রেয়'। সাত্রে বলেছেন 'সাহিত্যের সত্য বাস্তবের সত্যের চেয়ে অনেক ভিন্ন'।

কাজেই এই কু-তর্কের চেয়ে, আপনার নিজস্ব সৃষ্টি যতই স্থূল হোক, তাই নিয়ে অনবরত পড়ে থাকুন; একটি সূক্ষ্মতার ইঙ্গিত আপনি অবশ্যই তখন নিজের জীবনেই খুঁজে পাবেন যা আপনার কাছে আধুনিক-বোধ বলে মনে হবে।

প্রঃ নতুন লেখক প্রসঙ্গে বক্তব্য কী?

উঃ নতুন চিরকাল স্বাগতমেষু; তাদের লেখা যেদিন সৃষ্টি হবে না, সেদিনটিই হবে মানবপ্রজন্মের সমাধিস্থল। আমি যে অনন্তের ভেতর কতবার 'আমি'র ভেতর দিয়ে নতুন হয়ে এসেছি তার প্রমাণই আমির বাস্তবতা। বহু জিনের ধারাবাহিকতায় আজকের লেখকেরা যে নতুনভাবে তাদের সৃষ্টির ডালি সাজিয়ে ধরেছে --- সেই ডাল থেকেই লেখকের জন্ম। লেখক একই সঙ্গে পাঠক এবং লেখক।

আমি কী লিখছি তার পরিমাপযোগ্যতা, তার তুলনা-বিচার হয় নতুন লেখকদের হাতে। আমার লেখার স্থায়িত্ব ঘটে নতুন পাঠকদের সৃষ্টিবোধের ভেতর দিয়ে। অচল লেখাগুলো

নতুনের সৃষ্টির দাপটে মুছে গেলে বুঝতে হবে যে, লেখার অসারতা দিয়ে জগতে পাঠক-পাঠিকার মন ভোলানো বা মনে দাগ কাটা কোনোকালেই সম্ভব নয়। সুতরাং নতুন আসবেই চিরকাল তার তীক্ষ্ণ তরবারীসুলভ কলম হাতে নিয়েই। সৃষ্টির সাধনা তাই চিরকালীন আধুনিক।

প্রঃ কবিতালেখা কি মস্তিষ্কজাত এক ভাবনাপ্রকাশ, কবির যাপন-অভিজ্ঞতালব্ধ এক স্বগতোক্তি ?

উঃ হ্যাঁ, অনেকটাই soliloquy, স্বগতোক্তি। এই স্বগতোক্তি শুধু নাটকে অভিনয়েই নয়, বেঁচে থাকার এক আত্মগত সংলাপ যা কাউকে কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে না-উক্তি করেও নিজের সঙ্গে নিজের সংলাপ --- এটা বাইরে থেকে অনভিজ্ঞরা পাগলামো মনে করতে পারে।

কবিতা লেখার সময় পরের লাইনগুলো কী হবে, তা অবশ্যই কোনো বিজ্ঞানী এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি। বিজ্ঞানীরাই বলেছেন, মানুষের অন্তরের কথা, মস্তিষ্কের সার্বিক মেধাসত্তা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, মানুষের শ্রেষ্ঠতার ভেতর পূর্ণতার ভেতর 'সম্পূর্ণ' শব্দটির অর্থই এখন পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি।

সম্ভবত, ক্রমপর্যায়ে জিনগত আগমনের ভেতরে আজকের দিনে অসম্ভবভাবে দ্রুতহারে কম্পিউটার-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা থাকা সত্ত্বেও – কোনো মানুষের পক্ষেই কবি তৈরি করা যায় না; কবির জন্ম হয় কবিতা সৃষ্টির জন্যে; এবং তা কোনো অবস্থাতেই কোনো গবেষণাগারে কবি তৈরির ফর্মুলা তৈরি করার পদ্ধতি এজগতে যদ্দিন মানুষ থাকবে – সম্ভবপর হবেনা, তা আমি নিশ্চিত।

অন্তঃকরণের সঙ্গে নিয়ত, নিরবচ্ছিন্নভাবে, continuously এক সাঁকো বা linkroad অনুশীলনযোগ্য পদ্ধতি থেকে যায় কবির মস্তিষ্কে। যেটা যে যত ধরতে পারে তার আবেগ-কল্পনা তত বেশি জাগ্রত থাকে। এই কল্পনার প্রতিভা যাদের জন্মগত তাদের কবিতা ধারণ ক্ষমতা তত বেশি জাগ্রত। যারা সাধারণ স্তরে সাধারণ পর্যায়ে, কম অভিজ্ঞতায় শব্দ ব্যবহার করে কবিতার শরীর থেকে কিছু আদায় করতে চায়; তারা কালক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে; একসময় কবিতা যে লিখেছেন এতদিন, তার কোনো চিহ্নই কালের পাঠকের অন্তরে দাগ কাটে না।

তাই জীবনানন্দ ঠিক কথাই বলেছেন তাঁর কল্পনাপ্রতিভার শক্তিতেই যে 'সকলেই কবি নন কেউ কেউ কবি'।

প্রঃ কবিতা লেখাটা কি খুব জরুরি এসময়ে ?
উঃ একশোবার, হাজারবার, লক্ষবার জরুরি। কারণ, কোনো সময়েই কবিতা লেখার সময় নয় --- এ-কথাটা বলার মতো কোনো মানুষ যদি বেশি বেশি থাকে সংসারে; তাহলে এই জগৎ শুধু রোবট পরিচালিত হতে বাধ্য।
আকাশ-মাটির সংযোগ বেশি বেশি তাড়িত করে, তাদের বন্দি করার অধিকার কারুর নেই। পৃথিবীতে এ সময়েই কবিতা লেখার মোক্ষম সময়। প্রতিবাদী এবং বিবেকসমৃদ্ধ হার্দিক ভাষার জন্ম বহু পুরনো, আজও তা অব্যাহত। তাই উৎকৃষ্ট কবিতা চিরকালের।

প্রঃ 'কবিতা অধিক জরুরিবার্তা' এ পৃথিবীতে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর নাই তেমন কোনো জরুরি সংলাপ – যা দুনিয়া বদলে দিতে জানে। আপনি মানেন?
উঃ ভালো কথা। এ প্রসঙ্গে একটা আরবী প্রবাদবাক্য বলি 'আলজিভ নেই সেইসব কবিদের যারা মন্ত্রীর গা ঘেঁসে হাঁটে'।
কী বুঝলেন ! এইসবের সহমত লাইনও আজকের দামাস্কাস, সিরিয়ায়, প্যালেস্টাইনের কবিরা লিখছেন, লিখতে সাহস পাচ্ছেন।
সুতরাং, পৃথিবী বদলানোর আগে নিজেকে বদলাতে বদলাতে মস্তিষ্কে বিপ্লব ঘটাতে হয় আগে। মানবতার ধর্ম বজায় রাখার চেয়ে বড়ো বিপ্লবসাধনা পৃথিবীতে আর নেই। কবিরা অবশ্যই এর হৃৎপিণ্ডে বসবাস করেন।

প্রঃ কার জন্য, কীসের জন্য কবির মন কবিতা লেখায়, কবিতা-যাপনে সারাটা জীবন ব্যয় করেন ?
উঃ কবি জন্মায় তার কবিমন নিয়েই। বিশ্বখ্যাত লেখক ল্যু সুন বলেছেন 'যে-সমাজ প্রতিভা জন্ম দিতে ভয় পায়, সেই সমাজকে ধিক্'!
সারাটা জীবন বলতে কী বোঝায়!
আমি এই পৃথিবীতে কোটি-কোটিবার কবি হয়ে জন্মাতে চাই। কারণ ?
কারণ হল, কবিতা লিখে অর্থ-বিত্ত আসেনা; আসে চিত্তসুখ। এ-এমন চিদাত্মাসুখ যে তার কোনো বিনিময় মাধ্যম নেই, পরস্ব-অপহরণের স্পৃহা নেই, ব্যাঙ্ক লুট করার বাসনা নেই, মৌলবাদিতা নেই; নেই পৃথিবীকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদে আগুন ধরিয়ে মানব

প্রজাতিকে ধ্বংস করার বাসনা। কবিরা আর্থিকভাবে দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু সাধুতার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি-প্রবৃত্তি মেশানোর প্রতিভা আর কোনো শব্দ-প্রকৌশলীদের জানা নেই। জীবন একটি অনিবার্য কনটিনিউয়াস স্রোত। তার সম্পূর্ণতা জানার চেয়ে তার খণ্ডাংশ ব্যবহারেই সবচেয়ে বেশি সার্থকতা দান করেন কবিরা। সুতরাং জীবনধর্মে কবিরা স্বনামধন্য জায়গায় বসবাস করেন বলে, তাঁরা নমস্য।

প্রঃ কবিতাই কি শেষকথা --- পৃথিবীর লেখালেখির জগতে?
উঃ মানুষের অনেক কিছুই তো শেষ থেকে শুরু হয়। কেউ যদি মনে করেন পৃথিবীর যাবতীয় জঞ্জাল লেখার ভেতর তার কবিতাগুলির কয়েকটি বহুকাল টিকে থাকবে, আর সবই মৃত, ফসিল – তা ভেবে যদি কোনো কবি আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন, তাহলে তার চিৎকার তার হৃদয়ই শুনবে, আর কেউ না।

HOME

অণুগল্প

দড়ি ও মালা যুগান্তর মিত্র

রহিমুদ্দিন একটা ফুটখানেক দড়ির টুকরো ছুঁড়ে মারল নদীর জলে। পুরোহিত শ্যামাপদ গতকালের বাসি মালাটা জলে ফেলে দিতেই ভাসতে থাকা দড়ির চোখে পড়ল। হালকা চেহারা নিয়ে সে মালার পিছু নেয়। মালা তখন শরীর মেলে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল আপনমনে। গতি বাড়িয়ে একসময় মালাকে ধরে ফেলল দড়িটা। সে তার লম্বা শরীর মালার বৃত্তের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ফেলল মালাটাকে। মালার শরীরে শিহরণ লাগল। সে দড়িকে ছাড়াতে চাইল না। দুজনেই ভেসে চলল স্রোতের টানে।

ঘাটের ধারে বসে থাকা পাগলি ভানুমতি কী মনে করে হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। দড়ি আর মালা ছিটকে গেল। আকাশে তখন ঘন মেঘ কালো করে ছেয়ে ফেলেছ চারিদিক। HOME

অণুগল্প

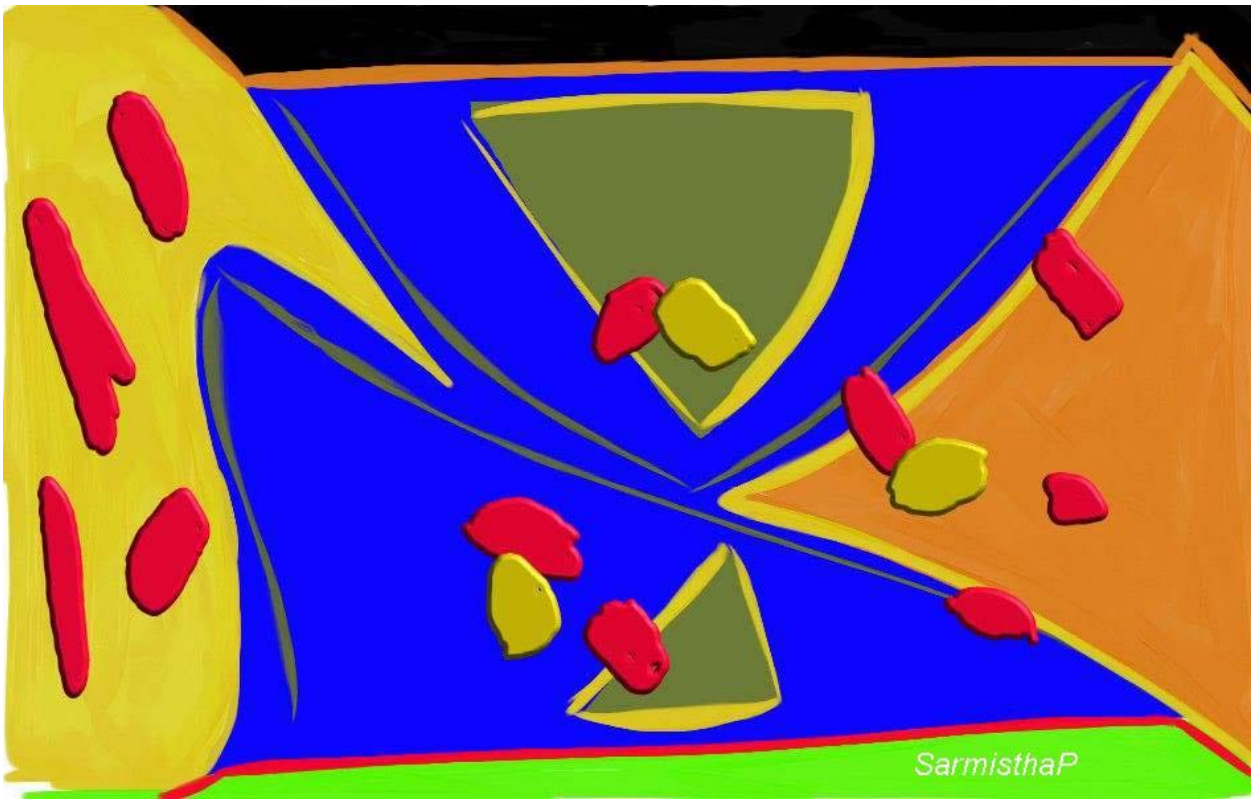

কথোপকথন

সদানন্দ সিংহ

--- আশুতোষ, তুমি কি ভাবছ ?

--- হ্যাঁ ভাবছি।

--- কী ভাবছ ?

--- ভাবছি অনেক কিছুই। ভাবছি এই আকাশ, এই বাতাস, এই পৃথিবী -- ।

--- আর ?

--- আর ? ভাবতে চাই অনেক কিছু। কিন্তু সব থমকে যাচ্ছে।

--- তাহলে স্বীকার করছ, থমকে একসময় যেতে হয়।

--- তাতে তোমার কী ? তুমিও তো থমকে গেছ।

--- আমার কথা বাদ দাও। তুমি শিল্পী, তোমার কথা আলাদা।

--- আরে আমিও তো মানুষ। তোমার শরীরে যে রক্ত, আমার শরীরেও একই রক্ত।
--- তা ঠিক। তবে তোমার যে ভাবনা সে তো আমার মত নয়। দেখো, আমি এখন আমার স্ত্রীর কথা ভাবছি। তুমি ভাবছ পৃথিবীর কথা--।
--- ঠিক আছে। আমিও এখন স্ত্রীর কথা ভাববো।
--- তারপর ?
--- তারপর আবার পৃথিবীর কথা ভাববো।
--- তার মানে তুমি আধা সাংসারিক আর আধা শিল্পী ! তোমার একূল না ওকূল তা তুমি বুঝতে পারছ কি ?
--- তুমি কী যা তা বলছ! আমাকে আমার মত থাকতে দাও। আর বিরক্ত করো না।
--- জানতাম, এসব প্রশ্ন তোমার ভাল লাগবে না।
--- যদি জানতে তবে এসব অবান্তর প্রশ্ন কেন আমাকে করছ ? তুমি কি আমার শত্তুর ? শোনো, শুনে রাখো। আমার ক্ষমতা অসীম নয়। সীমিত। আমি আমার সীমিত ক্ষমতার শেষ সীমানায় যাবার পর আবার আরেক সীমানার সন্ধান করি। সে সীমানার শেষপ্রান্তে যাই। আবার আরেক সীমানার সন্ধান করি। এভাবেই আমি বেঁচে থাকতে চাই। সংসারের ভেতরে। দয়া করে আমাকে বাঁচতে দাও। প্লিজ।

আশুতোষ চোখ বন্ধ করে দুহাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানে।

বাড়ানো হাত

ট্র্যাফিক জ্যাম। সামনে কিছু একটা হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে জ্যামে আটকে শেয়ার ট্যাক্সির ভেতরে চারজন লোক গরমে হাঁসফাঁস করছিল। সুবিমল এই চারজনের একজন, ভেতরের কেউ কাউকে চেনেনা। ড্রাইভার মাঝে মাঝে মুখ খারাপ করে আপন মনে আওড়াচ্ছে। পাঁচ মিনিটে আটকে পড়া গাড়িগুলি দু-তিন ফুট করে এগোচ্ছে।
এইসময়েই বাইরে থেকে একটা হাত এগিয়ে এসে সুবিমলের সামনে এসে থামে। সুবিমল একটু চমকে বাইরে তাকাতেই দেখে এক মুখ কালো দাড়ি আর লম্বা চুলের এক লোক বাইরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পরনে ময়লা শার্ট-প্যান্ট, অনেকটা পাগলের মত চেহেরা। দাড়ি-

গোঁফের আড়ালে পাগলের মত লোকটার চোখ দুটোকে দেখে ভীষণ চেনা চেনা মনে হল তার। এদিকে লোকটাও সুবিমলের সামনে থেকে হাত সরিয়ে সুবিমলের পাশের লোকগুলির দিকে হাত পাতে। একজন একটা কয়েন দিতেই লোকটা অন্য গাড়ির দিকে চলে যায়।

সুবিমল ভাবতে লাগল, লোকটাকে কোথায় দেখেছে আগে ? কোথায় ? ভাবতে ভাবতে তার মনে হঠাৎ পড়ে গেল। আরে এ তো শ্যামলেন্দুর দূর সম্পর্কের এক ভাই। বছর দুয়েক আগে শ্যামলেন্দুই ওকে তার কাছে একবার পাঠিয়েছিল কিছু একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। স্যুট-বুট নিয়ে ও সুবিমলের সঙ্গে দেখা করেছিল। কোয়ালিফিকেশান মাধ্যমিক পাশ। বলেছিল অসুস্থ মাকে নিয়ে ওর পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা। না, সুবিমল কিছুই করতে পারে নি ওর জন্যে। ও কি এখন সত্যিই পাগল গেল ? সুবিমল পেছন ফিরে ট্যাক্সির ভেতর থেকে দেখল শ্যামলেন্দুর ভাইটি তখন একটা প্রাইভেট কারের ভেতরে ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

HOME

গল্প

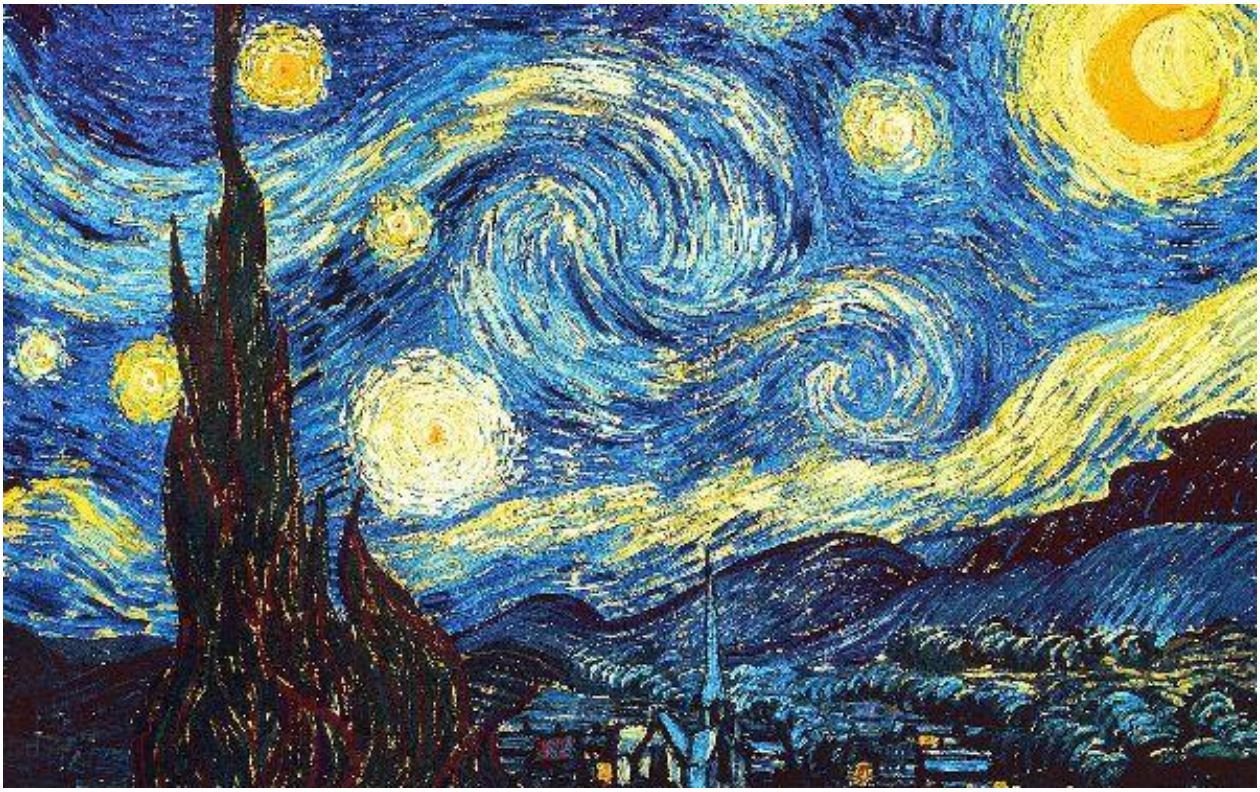

চক্রব্যূহ

সদানন্দ সিংহ

হঠাৎ কানের কাছেই যেনো গাঁক – গাঁক – গুঁক করে একটা আওয়াজ। ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে ফিরে শচীন্দ্র চেয়ারে একটু বসতে যেতেই এই অমানুষিক আওয়াজটা শুনে চমকে ওঠে। আওয়াজটা আবার হয়। গাঁক – গাঁক – গুঁক। চেয়ারে না বসেই সে দাঁড়িয়ে যায়। আওয়াজটা কীসের তা সে বুঝতেই পারে না। এইসময় কুসুম ঘরে ঢুকতেই সে কুসুমকে জিজ্ঞেস করে, ওটা কীসের আওয়াজ ?

কুসুমের হাতে একটা গামছা। ও হয়তো একটু আগে হাত মুছছিলো ওটাতে। গামছাটাকে আলনায় ঝুলিয়ে দিয়ে কুসুম জবাব দেয়, হেমেন্দ্রবাবুদের শুয়োর। সকালের দিকে একটা শুয়োরকে বাঁধা অবস্থায় উনাদের বাড়িতে ঢোকাতে দেখেছি। পালবার জন্যে বোধহয়।
কুসুমের মুখ থেকে কথাগুলি শোনার পর শচীন্দ্রের চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। ধপ করে চেয়ারে বসে বলতে থাকে, পালবার জন্যে আর জিনিস পেলো না। আজ থেকে শুরু হলো আরেক যন্ত্রণা। একটু শান্তিতে থাকবো তারও উপায় নেই। যত্তোসব –।
এবার শুয়োরটা ঘ-র-র-র করে আওয়াজ করে ওঠে। শচীন্দ্র ডান হাতে কপালের দুপাশটা চেপে শব্দ করে, উঃ। জ্বালালে দেখছি।
কুসুম ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, চা করবো?
--- করো।

মিলি চা নিয়ে ঢোকে। শচীন্দ্র ততক্ষণে অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় এক কোণে বসে পত্রিকার পাতা উলটাচ্ছে।পত্রিকার চারিদিক জুড়ে খুন, জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুট-ছিনতাই, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, ধর্ষণ, আমেরিকা-রাশিয়া-চিন-পাকিস্তান ইত্যাদি সব সংবাদে পরিপূর্ণ। এইসব সংবাদ না থাকলেও পত্রিকাগুলিকে পানসে মনে হয়। সংবাদগুলি যখন শচীন্দ্র একটা ঔৎসুক্য নিয়ে পড়ছে তখনই মিলি বলে ওঠে, বাবা চা।
এইসময় আবার শুয়োরটা আবার গাঁক – গাঁক – গুঁক করে ডেকে ওঠে। ইতিমধ্যে আওয়াজটা একটু গা সহা হয়ে গেছে শচীন্দ্রের। পত্রিকাটা সরিয়ে মিলিকে দেখে আর বলে, টেবিলে রেখে দে।
মিলি চায়ের কাপ সহ ট্রে-টা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে। চায়ের কাপটা ছাড়াও মুড়ি ভাজা রাখা একটি বাটি রয়েছে ট্রে-র ওপর। রেখেই মিলি চলে যায়। শচীন্দ্র পত্রিকা পত্রিকা পড়তে পড়তে চা-মুড়ি খায়। ত্রিপুরায় চরম্পন্থীদের তৎপরতা, মণিপুরে সেনাবাহিনির গোলাগুলি, বিহারে দুই নিম্নবর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, চিন-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা ---- এইসময়েই আবার ঘরের ভেতর ঢুকে মিলি শচীন্দ্রকে ডাকে, বাবা আরেকটু মুড়িভাজা দেবো ?

পত্রিকা পড়া থামিয়ে শচীন্দ্র মিলির দিকে চায়, না রে, আর খাবো না।

মিলির হাতেও চায়ের কাপ। সেও চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতে মিলি আস্তে আস্তে বাবার পাশে এসে বসে। বাবাকে দেখে। বাবা আবার পত্রিকার মধ্যে ডুবে গেছে। ইস, কি রোগাই না হয়ে গেছে বাবা। সারা বছর ধরে পেট খারাপ। প্রায় সারাক্ষণই খিটখিটে মেজাজ। সংসারের নানা ঝামেলা। এসবের জন্যেই বোধহয় বাবার মাথার সামনের দিকের চুলগুলি একদম উঠে গেছে। অথচ আগে এমন ছিল না। সে যখন ছোট ছিল তখন বাবাকে কি সুন্দরই না দেখাতো। এক ঝলক হাসি যেন বাবার মুখে সবসময় লেগেই থাকতো তখন। অফিস থেকে ফিরে এসেই তাকে কোলে তুলে হেঁটে বেড়াতো। রাত্রে ঘুমোবার আগে কতরকম সুন্দর সুন্দর ভয়ংকর রূপকথার গল্প মেজদা, ছোড়দা আর তাকে বসিয়ে শোনাতো। বড়দা বয়সে একটু বড় বলে বই পড়ার ভান করে দূর থেকে কান পেতে চুপি চুপি শুনতো। সেসব দিনগুলি আজ কোথায় বুদবুদের মত মিলিয়ে গেছে। বড়দার কথা মনে এলে বুক ফেটে কান্না আসে মিলির। কয়েক বছর আগে প্রকাশ্য রাজপথে লোকজনের সামনেই বড়দা খুন হয়ে গেলো। তিনজন আততায়ীর ছোরার আঘাতে ছোরার আঘাতে বড়দার হৃদপিণ্ডটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ওর একমাত্র অপরাধ --- অন্যায় জিনিসটাকে ও কোনদিন মানতে শেখেনি। কতোবার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকে বাবাও কেমন জানি পালটে গেলো। মেজদা আর ছোড়দার জন্যে বাবার আরো দুঃখ এবং রাগ। আর্টস গ্র্যাজুয়েট হয়ে আজো বেকার মেজদা শুধু চাকুরির দরখাস্ত করে যায়, কারণ দেড়বছর পরই তার বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে যাবে। ফলে সে সরকারি চাকুরি আর পাবেনা, এমন কি কোন প্রাইভেট ফার্মে যে কোনদিন কাজ পাবে তাও আশা করা যায় না। এদিকে আজ একবছরের ওপর হলো মেজদা তার ভালোবাসার পাত্রীকে ঘরে এনে তুলেছে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে এবং বৌদি এখন সাত মাসের গর্ভবতী। বাবা-মা অবশ্য এই বিয়েতে খুব একটা আপত্তি করেনি। শুধু বাবার মন্তব্য ছিলো, 'আমার যতদিন চাকরি আছে ততদিন না হয় কোন চিন্তা নেই; কিন্তু এরপরের ব্যাপারটা যেন তোরা ভেবে রাখিস'।

মিলি বাবাকে ডাক দেয়, বাবা।

টিভি দেখতে আর ভাল লাগছে না শচীন্দ্রের। তাজা সব খবরগুলি পড়ার পর পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়ার জন্যে শচীন্দ্র যখন বিশেষ বিজ্ঞাপনের কলমগুলি খুঁজছে তখনই সে মিলির এই ডাকটা শুনতে পায়। পত্রিকার পাতা উলটাতে উলটাতে মিলির চোখাচোখি হতেই সে দেখে মিলি তার দিকে এক মমতা মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তাই সে জিজ্ঞেস করে, কিরে, কিছু বলবি?

মিলি হাসে। বলে, তোমার ঘাড় টিপে দেবো বাবা ?

মিলি জানে, প্রায়সময়েই শচীন্দ্রের ঘাড়ে ব্যথা হয়। ব্যথা বেশি হলে আস্তে আস্তে সেটা মাথার দিকে চলে যায়। মিলি প্রায়ই ঘাড় টিপে দেয় বাবার।

শচীন্দ্র জবাব দেয়, দিবি টিপে ? আচ্ছা দে তাহলে।

চায়ের কাপ আর পত্রিকাটা টেবিলের ওপর রেখে শচীন্দ্র বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। মিলিও তার হাতের কাপটা টেবিলে রেখে বাবার ঘাড় টিপে দিতে আরম্ভ করে। বেশ আরাম লাগে শচীন্দ্রের। সত্যিই তার এই মেয়েটা তাকে সবসময়ই আরামে রাখতে চেষ্টা করে। খুব ভাল মেয়ে মিলি। সুখে ঘর করুক ও স্বামী-সংসার নিয়ে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওকে পাত্রস্থ করতে পারলো আর কই। কতো খোঁজাখুঁজি, পাত্রের বক্স নাম্বারে ঠিকানায় লেখালেখি ---- কোন কিছুই কাজে লাগে নি। মিলির বয়স আজ ত্রিশের কাছাকাছি। ছ বছর আগে কলা বিভাগে গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে করতে ও এখন আবার শর্টহ্যাণ্ড শেখার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মিলির জন্যে একটা সৎপাত্র না পাওয়া পর্যন্ত বোধহয় তার মুক্তি নেই। মিলি যে তার বড় স্নেহের।

--- বাবা।

মিলির ডাকে শচীন্দ্রের চমক ভাঙে। শুয়োরের আওয়াজটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। শচীন্দ্র উত্তর দেয়, কি রে ?

মিলি বাবার ঘাড় টিপে দিতে দিতে বলে, আজ পুলিশ এসেছিল আমাদের বাড়ি।

--- পুলিশ ?

রাগ ধরে যায় শচীন্দ্রের। গত বছর দুই থেকেই পুলিশ আসছে তাদের বাড়ি। হারামজাদা নিমুটা কিসব করে বেড়াচ্ছে --- মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা। ছিনতাইবাজির কথাও মাঝে মাঝে শুনতে পেয়েছে সে। তার এই ছেলেটাই হয়েছে সবচেয়ে বখাটে, বেশ কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েও স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি তাই অনেক বছর আগেই পড়াশোনা ছেড়ে

দিয়েছে সে। কুসুমের ওপর রাগ ধরে যায় শচীন্দ্রের। ছেলেটাকে বেশি করে লাই দিয়েছে ওর মা-ই।

মিলি আবার বলে, ছোড়দাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।
--- বেশ হয়েছে। ভালোই হয়েছে। আপদটা গেলেই বাঁচি।
একটা নিঃশ্বাস ফেলে শচীন্দ্র। আসলে ওগুলি তার রাগের কথা। কিন্তু ছেলে অন্ত প্রাণ কুসুম তো তাকে অন্যবারের মত কিছুই বলে নি এ ব্যাপারে আজ। মিলিকে সে জিজ্ঞেস করে, তো মা জানে ?
--- জানবেনা কেন। মা-ইতো তো দারোগাবাবুর কাছে কতো কাকুতিমিনতি করলো। কিছুক্ষণ থামে মিলি। তারপর আবার বলে, বিকেলবেলা ছোড়দা এসে বাড়িতেই খেয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে বোধহয়।
ব্যাপারটা বুঝতে পারে শচীন্দ্র। নিমুকে ছাড়া হয়েছে দেখেই কুসুম এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বলেনি, নইলে এতক্ষণ -- ।
মিলি এমন সময় ঘরের সুইচটা টিপে দেয়। আলো জ্বলে ওঠে। শচীন্দ্র জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়, চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে।
হঠাৎ শুয়োরটা আবার ঘ-র-র-র করে ডেকে ওঠে। শচীন্দ্র একটু চমকে যায়। ইতিমধ্যে সে শুয়োরটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো।

পরদিন সকালে হেমেন্দ্রবাবুদের বাড়ির হৈ-হুল্লোড়-হাসির শব্দে শচীন্দ্রের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে সে দেখে ঘরে কেউ নেই। মিলি, কুসুম দুজনেই উঠে পড়েছে। বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়িটা নিয়ে সে দেখে ছটা বেজে গেছে। উঠতে ভালো লাগে না তার। আবার চোখ বুজে পড়ে থাকে সে। তাছাড়া আজ ছুটির দিন। শুয়ে-শুয়েই সে মিলি আর বৌমার কথাবার্তা শুনতে পায়। কুসুম বোধহয় বাসন-টাসন মাজছে। দুই গুণধর ছেলের তো এইসময় বিছানা ছেড়ে ওঠার প্রশ্নই নেই।
আজ রোববার। আগামী সোমবার একটা বকেয়া ডিএ-র এরিয়ার বিল হবার কথা। কিছু টাকা তাতে হাতে আসার কথা। ধুস, অফিসের চিন্তা তার মাথায় বারবার এসে যায়। কতবার সে ঠিক করেছে অফিসের কোন চিন্তাই আর সে বাড়িতে এসে করবে না। কিন্তু

বারবারই অফিস সংক্রান্ত চিন্তাই সে করে ফেলে। বারবারই ভুল হয়ে যাচ্ছে। এইসময় শচীন্দ্র টের পায়, ছট ছট আওয়াজ করতে করতে কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে। শচীন্দ্র চোখ খুলেই দেখে মিলি ঘরে ঝাট দিচ্ছে। শচীন্দ্র উঠে পড়ে।

চোখ-মুখ ধুয়ে শচীন্দ্র যখন চা খেতে খেতে বাজারে গিয়ে মাছ কিনবে কিনা চিন্তা করছে, তখনই শুয়োরটা ভীষণভাবে গুক গুক করে আওয়াজ করতে আরম্ভ করে। সকালবেলায় এই আওয়াজটা অসহ্য লাগে তার। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নেয়। তারপর বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়ে। পেছন থেকে কুসুম চেঁচায়, শাকসব্জি কিছুই নেই ঘরে। নুনও লাগবে।

রাস্তায় নেমে আসে শচীন্দ্র। শুয়োরটার গু-ক গু-ক আওয়াজটা আরো বাড়তে থাকে। এই আওয়াজের সঙ্গে কিছু লোকের মিলিত একটা হৈচৈও কানে আসে। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় শচীন্দ্র কৌতূহলবশত হেমেন্দ্রবাবুদের বাড়ির দিকে লক্ষ করতেই সে দেখে দুজন লোক একটা খুঁটির সঙ্গে পেটে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা শুয়োরের পাগুলি বেঁধে ফেলবার জন্যে খুব চেষ্টা করছে হৈচৈ করতে করতে। আশ্চর্য, শুয়োরটা তার পাগুলিকে বেঁধে ফেলতে একদম দিচ্ছেনা। ফলে লোক দুজন বাঁধতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। শুয়োরটা খুঁটিটাকে কেন্দ্র করে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। শচীন্দ্র দাঁড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা দেখতে থাকে। লোক দুজনের একজন মাথা নুয়ে মুখে আঃ আঃ শব্দ করে শুয়োরটা পেছনের পা দুটোর উদ্দেশ্যে দড়ি ঢুকিয়ে দিতেই শুয়োরটা লাফ মেরে সরে যাচ্ছে। আবার অন্য লোকটাও একই চেষ্টা করে। শুয়োরটা আবার লাফ মেরে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সমানে শুয়োরটা আওয়াজ করতে থাকে গু-ক গু-ক গু-ক। শচীন্দ্র মনে মনে তারিফ করে, বাঃ শুয়োরের মাথায় দেখি বেশ বুদ্ধি!

বারবার ব্যর্থ হবার পর লোক দুটোর একজন কোত্থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা সংগ্রহ করে আনে। এনেই লোকটা লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে জোরে শুয়োরটার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দেয়। শুয়োরটা আর্তনাদ করে ওঠে। ব্যাপারটা এবার শচীন্দ্রের বেশ খারাপ লাগে। কোথায় যেন একটা মৃদু যন্ত্রণা হয়। একটা নিরীহ জন্তুকে বাঁধা অবস্থায় এভাবে আঘাত ! ছিঃ! শুয়োরটা তবু তার পাগুলিকে বেঁধে ফেলতে দেয় না। লোকটা তখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে শুয়োরটায় মাথায় পরপর লোহার ডাণ্ডা বসাতে থাকে। আর বাঁচার জন্যে শুয়োরটা তীব্র আর্তনাদ করতে করতে খুঁটিটার এদিক ওদিক দৌড়োতে

থাকে। শুয়োরটার জন্যে শচীন্দ্রের খুব কষ্ট হতে থাকে। আহা একটা অবুঝ জন্তুর ওপর এইরকম অত্যাচার ! উঃ। ডাণ্ডার আঘাতের প্রতিধ্বনি যেন তার মাথায় একটা অনুরণন তুলতে থাকে।

কিছক্ষণের মধ্যেই শুয়োরটার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। আস্তে আস্তে শুয়োরটার দৌড়াদৌড়ি এবং আর্তনাদের ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। একসময় আর শুয়োরটার পালিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না। রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। আর মার খেতে থাকে। শচীন্দ্রের আর দেখার ইচ্ছে হয় না। শরীরটা যেন কেমন একটা দুর্বল অনুভব করতে থাকে। এইসময়েই সে দেখে লোক দুজন চটপট শুয়োরটাকে বেঁধে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। তারপরেই লোক দুজনের একজন ঘরের দিকে মুখ করে চিৎকার করে, কিরে হলো নাকি ? চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আরেকজন লোক ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। লোকটার হাতে কাঠের হাতলওয়ালা আগুনে তপ্ত টকটকে লাল একটা লোহার শলাকা। লোকটা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে মাটিতে শোয়ানো শুয়োরটার হৃৎপিণ্ডে ভুঁস করে ঢুকিয়ে দেয়। শুয়োরটা আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে আর্তনাদ করতে থাকে। পা-গুলি ছুঁড়তে থাকে। শচীন্দ্রের হাত থেকে বাজারের থলিটা নিচে পড়ে যায়। একটা কেমন যন্ত্রণায় সে দু হাতে তার হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরে আর দেখে দোতলার ওপর থেকে হেমেন্দ্রবাবুরা শুয়োর মারা দেখছেন। শুয়োরটার আর্তনাদ যেন সবকিছুকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। বুকটা চেপে শচীন্দ্র রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে টলতে থাকে।

HOME

ছড়া

ন্যালাক্ষেপা ভোলা

অরুণিমা চৌধুরী

দুগগা ভারী কড়া গো মা! রাশভারী মেয়ে,
ছেলেমেয়ে সব এনেছে, শিবকে বাদ দিয়ে!!
বাবা ভোলা, ডোমকালা ভস্ম মাখে গায়ে
ঢুকতে যে তার মানা, ওমা! কে ওকে খেদায়!

মা দুগগার জন্যে কি শিব কান্না করে রোজ,
কে জোগায় তার তেলের বাটি, কেই বা ভুঁড়িভোজ
এ ক'দিন কে চুলো জ্বালে, কে করে বাতাস!
তাই বুঝি শিব ন্যালাখ্যাপা, জুড়েছে হুতাশ!

হয়তো ভোলা দুগগা মা'কে মিস করেছে, না মা!
দেখছো না তাই পুজো এলেই লুকোয় সুর্যিমামা!
মিস করেছে বলেই হয়তো আকাশ কাঁদছে রাতে
পুজোর ক'দিন ভাসলো যে তাই তুমুল বৃষ্টিপাতে

HOME

লেখাজমা

ঈশানকোণ দেয় ভাল লেখা প্রকাশের গ্যারান্টি। আপনার ভাল লেখাটি এখনই পাঠান।

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

* *ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না ।*
* *বহুল প্রচারিত নয় এমন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখা পাঠানো যাবে । তবে খুব প্রচারিত এমন লিটল ম্যাগাজিন, দেশ, আনন্দবাজার সহ অন্যান্য কমার্শিয়াল পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না। তবে নতুন লেখাই কাম্য ।*
* *যেকোনো লেখা পাঠাতে পারেন । চিত্রকলা, এমন কি ভ্রমণকাহিনিও।*
* *লেখা পাঠালে ধরে নেওয়া হবে সমস্ত নিয়ম মেনেই আপনার মৌলিক লেখাটি পাঠাচ্ছেন ।*
* *লেখা মনোনীত হলে ইমেল-এর মাধ্যমে দুমাসের ভেতর জানিয়ে দেয়া হবে যদি লেখক। লেখিকার ইমেল-এর ঠিকানা দেয়া থাকে ।*
* *লেখা অভ্র বাংলা কিবোর্ড দিয়ে লিখে ইমেল-এর মাধ্যমে পাঠাবেন ।*
* *ভাল লেখা এলে নতুন বিভাগ খোলা যেতে পারে।*
* *লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ।*
* *লেখা WORD বা OPEN OFFICE ফাইলে পাঠাবেন, PDF বা অন্য ফাইলে পাঠাবেন না। এছাড়া ইমেলের বডিতে লিখেও পাঠাতে পারেন।*
* *অমনোনীত লেখাগুলি লেখক-লেখিকাকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে ইমেল এর মাধ্যমে।*
* *আপাতত বছরে চারটি সংস্করণ FEB-MARCH, MAY-JUNE, AUG-SEPT ও NOV-DEC নাগাদ বেরুবে। আগামী সংখ্যার জন্য আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এখনই । স্কেচ সহ পারলে পাঠান।*
* *ইমেল-এর মাধ্যমে লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ—*singhasada@gmail.com
* *লেখা ফেসবুকে ইনবক্সে নিম্নলিখিত লিংকেও পাঠাতে পারেনঃ--*

https://www.facebook.com/sadananda.singha.9

* *এছাড়া আলোচনার জন্যে পত্র-পত্রিকা পাঠাতে পারেন নিচের ঠিকানায়ঃ--*

পদ্মা সিংহ

C/O- *নন্দালয়, লাইফড্রপ ওয়টার প্ল্যান্টের পেছনে,*

অভয়নগর, আগরতলা। PIN-799005

[*লেখক-লেখিকাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ লেখা পাঠিয়েই ঈশানকোণ প্রকাশের আগে সেই পাঠানো লেখাটি ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় নিজে বা অন্যের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন না দয়া করে*]

HOME

ছড়া

বাংলা আমার

শঙ্কর দেবনাথ

বাংলা আমার স্বপ্ন খামার
মগ্ন ভালবাসা–
বুকের আশা- মুখের ভাষা-
সুখের আলো-আশা।

বাংলা আমার বাবার ঘাম আর
দাদার পদ্যরাশি-
মায়ের শাড়ি- গাঁয়ের বাড়ি-
ভায়ের-বোনের হাসি।

বাংলা আমার রহিম-রাম আর
সবার মিলনমেলা-
পাখির কূজন ভ্রমর গু'জন-
সুজন মাঝির ভেলা।

বাংলা আমার কাঁঠাল-আম আর-
তাল-সুপারির শাখি-
ধানের বুকে- প্রাণের সুখে
ঘ্রাণের মাখামাখি।

বাংলা আমার রঙিন জামার
পকেট ভরা ছড়া-
জীবন-ফাগুন- চিতার আগুন-
শান্তিতে ঘুম পড়া।

জীয়নকাঠি

শঙ্কর দেবনাথ

নুন আনিতেই পান্তা ফুরোয় – কানটা ঝালাপালা-
নেই কিছু নেই – ভয় পিছু নেই – মনটা বলে – পালা।

চতুর্দিকেই ফতুর সবই – স্বস্তি নেই এক তিলও,
পুড়ছে দেহ – ঘুরছে মাথা – উড়ছে শকুন-চিলও।

মন ভাল নেই – ক্ষণ ভাল নেই – জীবন বিষাদ্ভরা –
এইভাবে আর ক'দিন যাবে ? বেঁচেও যেন মরা।

ভাবছি এবং কাঁপছি খেদে – হঠাৎ এসে খোকা,
ডাকলো – বাবা, আঁকলো বুকে জীয়নকাঠির টোকা।

স্বপ্ন নাচে চোখের কাছে – খোকন হাসে কোলে –
মন ভাল হয় – ঘর আলো হয় – কষ্টরা যায় চলে।

একটি না ছড়া

শঙ্কর দেবনাথ

যার চোখে চাঁদ ছিল বাঁধভাঙা কিরণের-
তার চোখে পোড়ে আজ আগুনের পীড়নেই।
যার মনে পাখা ছিল, আঁকা ছিল কল্পনা
তার মনে হানা দেয় ডানাভাঙা গল্পরা।

যার বুকে নদী ছিল – যতি ছিল না ধারায়
তার বুকে নাচে সুখে অবিনাশী বাঁধারাই।
যার মুখে হাসি ছিল- বাঁশি ছিল সুস্বরের
তার মুখ দুখ দুখ তাঁতে মরু ঊষরেই।

যার ঘর ভরা ছিল জ্বরাহীন ফুলে ফুলে
তার ঘর জর্জর মৃত্যুর হুলে হুলে।
যে বায়ুতে প্রাণ ছিল – ঘ্রাণ ছিল পরাগের
সেই বায়ু আয়ু গিলে খায় ক্ষোভে ও রাগে।

কবি কেনারাম

শঙ্কর দেবনাথ

কেনারাম কবি – তার কবিতার অঙ্গে –
ভয় নাড়া গয়নারা দোলে নানা রঙ্গে।
শব্দের শবদেহে তা তা থৈ চিত্তে –
বর্ণের বর-বউ মাতে রাতে নৃত্যে।

ছন্দেরা সন্দেহে বোল তোলে ধিন্ তা –
মিল এসে ঢিল ছোঁড়ে – নেই কোন চিন্তা।
হাব-ভাব বুঝে ভাব ড্যাবডেবে চোক্ষে-
ভাবে বসে – যাবে গো সে কোন গোবি-মোক্ষে।

মাথা ভরা – খাতা ভরা গিজগিজে কাব্য-
পলি খেলে হোলি আর নদী হয় নাব্য।
কেনারাম কবি-কে না মানে এই বাক্যি!
কবিতার আদালতে দাদারাই সাক্ষী।

HOME

কবিতা

লোভ

প্রণব বসুরায়

আলো থেকে এক জটিল অন্ধকারের দিকে
সরিয়ে দিচ্ছো রেশমি রুমাল--
বাতাস হাল্কা, অক্সিজেন কমে যাচ্ছে
সমানুপাতিক হারে।
সূর্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে
তুমি পাহাড় ভাঙার খেলায়, নীল ভস্ম
ছড়াতে ছড়াতে লঘু পায়ে চলে যাচ্ছো...
ট্রাম এসে পড়ে কেল্লার দিক থেকে
রথের বাজারে যাবার—দাঁড়ায়—চলেও যায়...
এরপরে গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায়
শুরু হয়ে যায় তুমুল দুর্যোগ। এ দুর্যোগে
মাটি জ্বলে ওঠে, কপট ঝড় আসে,
একটা আগুন-বলয় মনুমেন্টের গায়ে মালার মতো...

এ সময়ে ঝলসে যেতে যেতে
একবার আকাশের নীলিমা দেখে নিতে বড়ো লোভ হয়

কবিতা

তীরন্দাজ

অভিজিৎ চক্রবর্তী

নেমে যাই সঘোষে অঘোষে
তদ্ধিতে আর কৃতে, সমাস
সন্ধি ঘেঁটে মুক্ত করি রুদ্ধ
উপমা। যদি গোলাপ ফোটে;
অন্ধকূপে উৎসারিত জল
সূর্য আর চাঁদে নিপাতনে
সিদ্ধ করি, রঙ করি; ধুলো
রেণু হয়, তবু যদি খাদ
থাকে মিশে, যদি জল আর

আগুনে হয়না বন্ধুতা, তবু
যদি রন্ধ্র অসমাপিকায়
যায় দেখা, তখন এ হাড়
মজ্জা, তামা ও লোহার ভার
দধীচির মত পারি দিতে;
হলে বজ্র হানির আঘাত
মূলে, যেন জন্ম কেঁপে ওঠে
যেন তোর মৃত্যু কেঁপে ওঠে

বাচাল

অভিজিৎ চক্রবর্তী

তোমার কথার উল্টো মানে করব বলেই জন্ম
ফোটাব সাজিনা ফুল খোঁপায়, ভালো যে বাসো তার জন্য
কথার পাঁকে ফাঁকে ঘটনায় অঘটনে খালেবিলে
এ আমার জন্মগত অধিকার, শূন্য হাতিয়ার-
খালি হাতে বিরোধীতা, নেমেছে জোয়ারে যত,
এরপর যদি না হয় কিছু, মানোনা কিছুই, জেনো
উল্টোখাতে বয়ে গেছি শুরু থেকে এখনো
স্রোতের টানও ছিল সব দিকেই মোড়ানো
এ এমন এক খেলা, মাঝেমাঝে ভুল চাল
মাঝেমাঝেই মারপ্যাঁচ, তোমার কথার মানে
বদলে গেছে কখনো, অজস্রবার ধাক্কা খেয়ে যদিবা
দেখি, না আমি- আমার, ছিন্ন পাল নড়ে

তুমি ভাবো দল, ভাবো কথার পাকের শক্ত
বাঁধন – পাথর লেগে আছে,
থাকবেই, যেহেতু কোলাহল দিনদিন বেড়ে যায়—
যেহেতু কথার জাল ছাড়া কিছু নয় – সেইজন্য
সব কিছুরই উল্টো মানে হয়, হয়ে যায়

চুলা

অভিজিৎ চক্রবর্তী

খুঁচিয়ে তুলছি সব বীতরাজ ক্ষোভ
হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় নিদ্রা, ঘনলোম-বুক

দেখে ভালোবেসেছ তা এখন লোমের
নামে দিলাম হৃদয়, অকালপক্ক ব্যাটা

ছেলে দেখো সিটি মারে – হাতখরচ যা
সব কেটে রেখে দেবো, জানোনা আমায়

অনেক দিনের রোজ, পকেট কাটার
লোভ সামলে তবে তো দাঁড়াবে, বাজারে

যাবে, বাজারে আমার খুচরো বিনিয়োগ
কথায় ঝাল আছেই, আধুলিতে কিনি

দিনান্তের সূর্য, ঢলে পড়ে পশ্চিমের
ভিটায় – যেন কত না স্বাভাবিক, ঘুম

আসেনা দুপুরে, মাথা চড়ে, তা প্রেমের
বারোটা বেজেই যায় – পথে পথে হ্যাঁচকি

তুলে ফিরি, কুটকুট কাটে ইঁদুর – আঃ
দিগন্তের হাসি, ঠোঁটে তার আঁচ বাদামী থেকেই যায়

কথার ভাঁজে

অভিজিৎ চক্রবর্তী

সব কথার প্রান্তরে মুখ থাকবে এমন নয়
সব লেখারই দু'দিকে যে খোলা ডানা ভেবোনা
কিছু কথা যার একপ্রান্ত ঘরে
অন্যপ্রান্তে পাখি ওড়ে
কিছু কথা যার দিকে যত বাড়াও – অধরা
কোন ঘুম যেন একা বৃষ্টি ভিজে
কোন রাত পচা ভাতের মতন –
সব প্রেমেই অচেনা গন্ধ থাকে, আর নুন
সব মানুষেরই ঘ্রাণে গোপনতা আছে
ঠোঁটের ওপর মধু কারো একটু লেগেই থাকে –
কোনও কোনও মুখ অন্ধকারেই মানায়
কোনও দিন যা ঘোলা আলোয় নাচে
সব কথারই অপর পৃষ্ঠা আছে, আছে ছুরি-জিভ ফলা
সব কথারই গোপনে জানালা আধখোলা—
ভেতরে মেয়েটি হাসে – বিবাহ মানেনা যেই
একটুখানি আকাশের মোহ সব মানুষেরই

থাকে, বাঁচিয়ে রাখেই লোকে—
সব দিনের ভাঁজেই সেই মেয়েটি ঘুমায়
বাবু খুঁজে খুঁজে রাতে যে গলি-মুখে দাঁড়ায়

গানের ছলে

অভিজিৎ চক্রবর্তী

আমার গানের ভাঁজে বন্দুক রাখা আছে
রোজ তেল দিই, মুছে রাখি
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জং পরিষ্কার করি
রোদের দিকেতে তাক করে
দেখি ফুটো দেখা যায় কিনা
বন্ধুকে মরিচা হলে গান ভালো জমবে না
মরিচা পড়তে দিইনা

বেশি কথা হলে ট্রিগার চাপতে ইচ্ছে হয়
মাথা ঝমঝম করে, শিখা জ্বলে ওঠে, যেন
রেল পেরোয় পুরোনো ব্রিজ
বেশি নীরবতা এলে
মৃত্যু শীতলতা ঘিরে ধরে
ধূ ধূ শব্দ যেন আনাড়ি নির্বীজ
সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটা

রাগ ওঠে, রাগের অনুশীলন করি
কেঁপে যায় রেখা শীতে
কাঁপন অনুশীলন করি

এখন গানের ছলে হাসতে হাসতে
বন্ধুকই তুলে ধরি
লোকেরা গরম টের পায়
ফ্যাকাশে সাদা – স্বাভাবিকই লাগে
বন্ধুক তাক করলে গানই বেরোয়
চাপ চাপ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে

পাহারা

অভিজিৎ চক্রবর্তী

তোকে সারাদিন কুত্তা-খোঁজা খুঁজেছি

অবসন্ন দীর্ঘ লতারোদ

মড়মড় করে ভাঙে ঘরদোর

ঝাঁপিয়ে পড়া গত জন্মের ক্রোধ

রক্তের ঘ্রাণ যদিও পেয়েছি হাড়ে

শেষবার রিডে চাপ দিলে বাজে সা

এই ছিল তার শখের পায়রা পোষা

পায়রা এবার মৃত্যুর গান গা

ছিন্ন করোটি হাতে নিলাম দ্যাখ

খুলিভরে তোকে ফিরিয়ে দিলাম গান

খুলিভরে তোকে ফিরিয়ে দিলাম হাসি

কুত্তা আজ স্বর্গ ভুলে আসে

গানের শস্ত্র শুঁকে পায় ঘাসে ঘাসে

এখন তুই মৃত্যুর নামে বাজি

গত জনমের ফেলে যাওয়া সব দাবি

খুঁজে খুঁজে আজ রোদেই ফিরে গেছি

নিজের লাজ নিজেই আগলে রাখি

ভালোবাসো গাছ

অভিজিৎ চক্রবর্তী

গাছকে কাতুকুতু দিলে গাছ হেসে ওঠে জানো!
গাছে হাত দিতে গেলে ভাবো কোথায় দেবে!
তোমার শরীরে যেমন সবখানে হাত দেয়া যায়না
হাত দিতে দাওনা – অধিকারে ঢেকে রাখো কোন কোন স্থান

গাছেরও আছে তেমন গোপন – আছে নাভি, আছে স্তন
আছে বগলের তলা, ঊরু – হাত দিলে গাছ লজ্জা পায়
অস্বস্তি হয়; এখন না বুঝে হাত দিলে
গাছ তো রাগ করবেই –
রাগ করে দুটো চড় কষালে সে কি ভুল হবে?
অপরাধ হবে? হবেনা তো!
কেউ কেউ গাছের সঙ্গে দীর্ঘদিন রাত কাটায়
তুমি তাকে সহবাস নাম দিতে পারো
কেউ কেউ গাছকে চুমো খায়
গান শোনায় – গান শুনে শুনে গাছ গর্ভবতী হয়,
ভালোবেসে হাত বাড়ায় – দেখো গাছ কেমন
খুশি হয়ে ওঠে, তোমায় জড়িয়ে রাখে

HOME

ছড়া

শ্যামাপদ

দেবীস্মিতা দেব

আহ্লাদে গদগদ
আমাদের শ্যামাপদ
থেকে থেকে ল্যাজ নাড়ে
দেখেছ?
খায় দুধ, ভাজা মাছ

না পেলে বাংলা পাঁচ
বোতলেতে দুধ ভরে
রেখেছ?
শ্যামাপদ মাছ খায়
দুধ খায় ভাত খায়
একদম বিটকেল
মর্জি
কেনা ড্রেস পরে না
বাসে ট্রামে চড়ে না
আছে তার বাঁধাধরা
দর্জি।
প্রাইভেট কারে চড়ে
থাকে তেতালার ঘরে
তাই নিয়ে সে কি তার
গর্ব।
গান শোনে টি.ভি. দেখে
ব্যায়ামটা রোজ শেখে
মাঝেমাঝে বলে বসে
"পড়ব"।
রাখা হল টিউটর
ব্রাইট বুঝি ফিউচর
পড়া ভুলে শ্যামা বলে
ম্যা-আঁও

কানদুটো মলে সেই
স্যার চলে গেল যেই
শ্যামাপদ কাঁদে খালি
ভ্যা-আঁও।

HOME

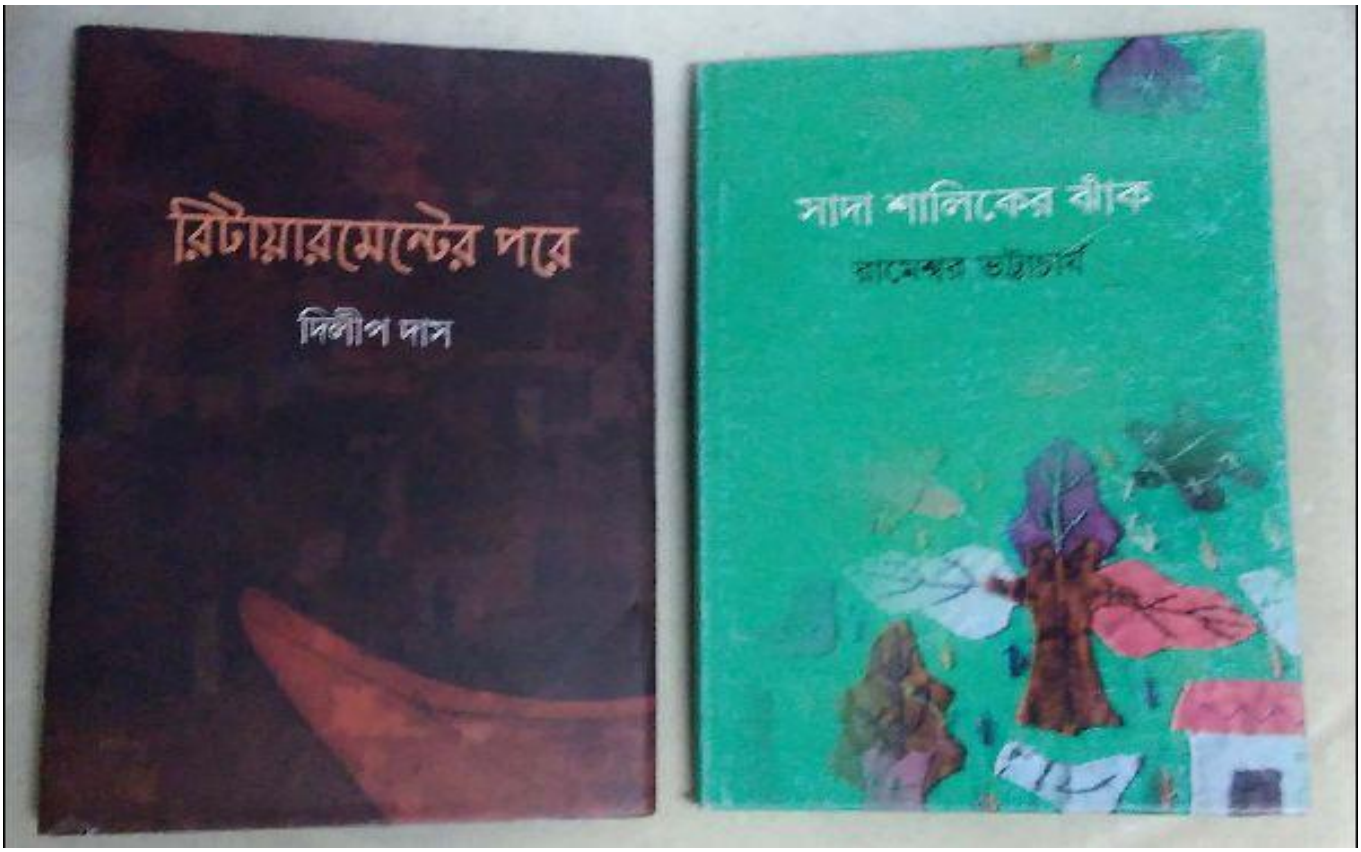

কাব্যগ্রন্থঃ রিটায়ারমেন্টের পরে কবিঃ দিলীপ দাস
আলোচনাঃ শুভেশ চৌধুরী

উৎস কথা ‘হোসে মার্তি’র কবিতার সাথে একসাথে বাঁচার অঙ্গীকার কবি দিলীপ দাসের। কাব্যগ্রন্থের শীর্ষক কবিতাটিতে সময় স্থির আপাত কবির দৃষ্টিতে যা কবিই আবার বহমনতায় নিয়ে গেছেন গীতিময়তা ও মরমী আবেগ সহকারে, পঙতিতে পঙতিতে কবি মূলত পিছনে তাকিয়েছেন একটি সীমারেখার ওই পারে। যেই দিন অতিক্রান্ত, সেই

দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে, ভালোবাসার দিকে ফিরে, তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, পরমুহূর্তটিতে প্রত্যক্ষ করেন, আজ যেন নিজেকে সময় দিতে পারছেন না, তাই অভিমানী আর আবিষ্কার করে ফেলেন বড় বেলাটিকে –

"সময় আমাকে আর শাসন করে না।
চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলি
বেহিসেবী শিশুর মতো, তারপরও
পকেট ভর্তি অজস্র অনিকেত সময়"

এই কাব্যগ্রন্থের একটি বিশাল আকাশ ওই 'পরবাস'। কবি এই নামেই সীমারেখার যে প্রান্ত তাকে এতোদিন শাসন করে আসছিল তাকে নামকরণ করেছেন। রিটায়ামেন্টের পরে এই অনিকেত সময়েই তিনি বাসাবদল করেছেন।

বাসাবদল করার পরও সময়, পরিস্থিতি, দৈন্য, হতাশা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কথা বলতেই হচ্ছে তাকে। কবিতা তাঁর মুখপাত্র। প্রকাশ করছে কবিতা একটি সময়কে, ব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করে দেখাচ্ছে মৃত শরীরের ব্যথা, পুঁজ, আঘাত, ক্ষয়।
১)
আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে ছেড়ে দে
কাতর আর্তনাদ জুড়ে অন্ধকারের মাংসপিণ্ডগুলো।

আমি জানি,তাদের পিতা কে।
সে এক উদ্‌ভ্রান্ত অসুস্থ, বস্তুত যে পুরুষ নয়,
নারীও নয়, সে এক ক্লীব ক্লিন্ন জীব। তাকে চেনে
মৃত নদী, বরফ ঠাণ্ডার হাত,
শ্মশানের নির্দয় হৃদয়, আর
ভনভনে মাছিদের লোভী, পাংশু ঠোঁট।
[অন্ধকার]

২)

আপনি বলেছিলেন মার্কস, প্রভুভক্তি নয়,
ভক্তের মতো নিঃশর্ত আনুগত্য নয়।
সন্দেহ করো। প্রশ্ন করো। তর্ক করো।
……
……
তবু, এটুকু যে জেনেছি, এ-ও তো কম
নয়। মানুষের প্রতি অনুগত হও।
সবচেয়ে পেছনে পড়ে আছে যে মানুষ
তুমি তাঁর পেছনে বিনম্র হয়ে দাঁড়াও।

[পাঁচই মে]

কাব্যগ্রন্থ পাঠে ভালোবাসায় আমি আক্রান্ত হই। যেমন, সাধারণ ও মহান দুইই মহান হয়ে আছেন আমাদের জীবনে। পিতা থেকে চাচা বঙ্গবন্ধু, সবাই আর যে সব নারী পুরুষের উপস্থিতি জীবনকে মহার্ঘ করে আছে, তাঁকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে কবি দিলীপ দাস অবসরপূর্ব (শুধু আক্ষরিক) মুহূর্তগুলোর একটি রূপরেখা টানতে চেয়েছেন, যা তাঁর হৃদস্পন্দন।

৩)

কোথায় হারালো এমন উদার আকাশ
কারা কেড়ে নিল এমন দরাজ দিলের
দৃপ্ত, সাহসী বাঙাল –
যার চোখে বাংলার শ্যামল তীর
বেড় দিয়ে আছে, বেদেনির মতো
সুঠাম কাঁকাল ?

[হাওড় (বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতে)]

৪)

চাচা যখন রাস্তার পাশ দিয়ে
নিরীহ হেঁটে যেতেন,
আবার নিঃশব্দে ফিরে আসতেন
স্যাঁতস্যাঁতে পুরোনো তার পাড়ায়,
দু-চারজন ছাড়া কেউ জিজ্ঞেসও করত না,
কেমন আছেন মশায়?
চাচা কিন্তু সবার খোঁজ রাখতেন।
[চাচা হো]

৫)
আমার নিঝুম চাঁদ
জোছনা ছড়াচ্ছে জারুলের ডালে।
আমি তার এক সারি পেছনে বসে
দেখছি, তার ডান গালে
কোথা থেকে এসে মায়াবি আলো পড়েছে।
[নিঝুম চাঁদ]

পুনশ্চ
কবি দিলীপ দাসের বর্তমান কাব্যগ্রন্থ 'রিটায়ারমেন্টের পরে'-র উপর আমার এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত বাস্তবতা।
দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ। সর্বোপরি প্রচ্ছদে নৌকাটির উপস্থিতি সময়কে যেন গতিময় করে তুলেছে।
প্রকাশকঃ অক্ষর পাব্লিকেশন। প্রচ্ছদঃ ইমানুল হক। মূল্য একশ টাকা।

কাব্যগ্রন্থঃ সাদা শালিকের ঝাঁক কবিঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য
আলোচনাঃ সন্‌জিৎ বণিক

“সাদা শালিকের ঝাঁক” রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। প্রচ্ছদে পুষ্পল দেব চমৎকার এক আবহ ধরেছেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য কবিতা কম লিখলেও যা লেখেন সহজসরল রহস্যাবৃত এক ছবি যা আমাদের ভাবনাজগৎ বিচরণে সহায়তা করেন ও ছবির মাত্রামননকে নতুন আশ্রয় দেন। তিনি বইটি মাকে উৎসর্গ করেছেন। এরকম বই মায়ের রাতুল চরণে এক পুষ্পার্ঘ, কবির মনের সারাজীবনের ধ্যানবিন্দু। ভালো লেগেছে। এবার কবিতায় ফিরে যাই। “তিতাসনামা”-র বারটি কবিতা আর অন্যান্য বত্রিশটি, মোট ৪৪টি কবিতায় কবির অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কবিতার চিত্রকল্প ও কাব্যমূর্ছনা জাগিয়ে তুলেছেন। প্রাণ দিয়েই কবিতার চরণ এঁকেছেন। উল্লেখ করার মতো সবক’টি কবিতায় মনে দোলা দেয়।“তিতাসনামা”-র ৫ নং কবিতায় কবি বলেছেন-

"বোতামটা খুলে যেতেই
আকাশ থেকে নামে বৃষ্টি
……
বোতামটা ঠিকঠাক করে
ফেললেই আকাশ থেকে
উড়ে আসবে এক দঙ্গল সাদা শালিক"।

শ্রদ্ধেয় জননেতা নৃপেন চক্রবর্তীকে স্মরণ করে লেখা “তিনি” কবিতায় বলেছেন—

"রোদে ঝলসানো মেঠো পথে
তিনি হেঁটে যাবেন একাকী,
ফসল তুলে নিয়ে গেছে সব
এখন শুধু ধূ-ধূ প্রান্তরে তাঁর দৃষ্টি
অসীমান্তিক। ভাঙা চেয়ার, এক
বাটি গুড়-মুড়ি, আর শান্ত সন্ধ্যা
এই ছিল তার পরম আশ্রয়"।

‘তিনটি স্তবক’’ কবিতার প্রথম স্তবক এইরকম—
"যা ভাঙতে চাই তা পারছি কোথায়
যা বলতে চাই তা যাচ্ছে কোথায়
যা দেখতে চাই তা দেখছে কে
যা শুনতে চাই তা দিচ্ছে কে
যা গড়তে চাই তা ভাঙছে কোথায়
যা ভাঙ্গতে চাই তা পারছে কে"?

‘‘উর্মিলার জন্য দু-চার পঙক্তি’’ কবিতায়-
"এখন সময় বড়ো নিষ্ঠুর
এখন মানুষের হৃদয়ের বৃক্ষবাটিকার কথা কেউ জানে না
কে যে সুমনস আর কে যে চতুর কানাই,
তার খোঁজ কে রাখে"?

‘‘অক্ষর জেগে উঠলে’’ কবিতায় কবি বলেছেন—
"অক্ষর জেগে উঠলে ভেঙে পড়বে
কারাগারের চতুর্দেয়াল
অক্ষর জেগে উঠলে ঘুচে যাবে
চাঁদের চিবুকে জমে থাকা ব্রণ
অক্ষর জেগে উঠলে তিতাসের ঢেউ
ছাড়িয়ে যাবে শহিদের প্রান্তর
অক্ষর জেগে উঠলে মানুষের মিছিল
ছুটে যাবে সীমানার দিকে"।

‘‘মেঘবালিকার বিরহ কথা’’ কবিতায় উজ্জ্বল চমৎকার কয়েকটি লাইন---
"মেঘবালিকার দুঃখের কথা যদি

জানতে চাও, তাহলে যেতে হবে
ভাইরাসহীন ল্যাপটপের কাছে
সেখানেই পাওয়ার পয়েন্ট
বন্দি হয়ে আছে
সব বইনারি বিরহ কথা"।

কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর কথা মনে রেখে যে কবিতাটি তার নাম ‘‘ষোড়শী’’। কবিতার শেষ তিন লাইন এইরকম-
"কাদামাটি ঝেড়ে ফেলে দিলে দুটি চরণই
এখন স্বর্ণময় হয়ে উঠবে। কবি এখন
নতজানু ষোড়শীর কাছে"।
কবিতার কথা ও বর্ণনা চমৎকার বলে ফেলতে পারেন, একজন কবিতাপ্রেমী মননশীল ভাবনা যাপনের পথ ধরে আঁকেন কবিতা। কবি রামেশ্বর আরো আরো চমৎকার কবিতা লিখবেন। আরো আরো সুন্দরতম কবিতা পাবো আগামী দিনে এই বিশ্বাস।
প্রকাশকঃ অক্ষর পাব্লিকেশান। প্রচ্ছদঃ পুষ্পল দেব। দাম ৭৫.০০ টাকা।

HOME

কবিতা

কথারা কাঁদে

বাপ্পা চক্রবর্তী

এক

ভেসে যায় পালক, ভিতরে স্রোত আমি যাই
মন ঝুঁকে আছে নদী পাড়ের বাঁশ গাছের মত
অক্ষরের ছায়ায় শব্দ রোদ প্রজাপতি
অনাবেশী কথা চিহ্ন খোঁজে অবক্ষয়ের আদলে ।
ঘরের মাটি খন্ডিত হচ্ছে ।
শ্মশানে যারা আছে তারা জানেনা
ডোমের খেলায় গা ভাসায় পরান জ্বলিয়া যায়
জল ঢেলে চুলা ভাসিয়ে ফিরে নিজের কাছে ।

দুই

গা বেয়ে অসংখ্য সুতো ঝুলে আছে
স্বপ্নের আলোমাখা প্রিয়জনের সাথে
আকাশ খুলে দেয় মুক্ত কথা
সাদা মেঘেই অক্ষর শব্দ হয়
দরজার বাইরে রোদ
ঘরময় কথা ওড়ে
প্রজাপতির রঙিন পাখায়
অবুঝ খাতায় ভাঁজ করে রাখা সময় পুড়ে
কথা কাঁদে
প্রতিটি রেখায় এখনো রক্ত চলাচল করে
সূর্য লুকায় । ভরসায় নেমে যাওয়া
কচি হাতে লুকিয়ে থাকতে হয়
কাল আবার উড়াল ।

তিন
শীত যায় যায়
হাওয়া ঢুকে গেছে মনে
ভেসে আসছে মেঘ-ফুল, পাতা; মুকুল দুলছে ।
শুষ্ক মনোভূমির
খাল বিল নদী
চাতক চোখ ।
কত স্নান হল, বৃষ্টি ভেজা হল
মন, দৃশ্যেই ডুব দেয়
ভিজে ওঠে

আসলে হাওয়া বন্দি
মুক্ত, মন আর দৃষ্টি ।

HOME

কবিতা

সময় ও রাত্রি - ১

বিমল বণিক

হে সুন্দরী
তোর দেহ রচিত হল এই রাত্রিতে
এই রাত্রিতেই সকল সংসার রচিত হয়
তোর দেহে
এই রাত্রিতেই সকল গবাদি পশু লুটে নেয়
তোর শরীরের গাঢ় ঘাস

এই ক্ষুধাতুর দেহে জল নেই আজও

অথচ একমাত্র তৃষ্ণা ছিল আগে, ছিল ক্ষুধা ।
সূর্য উঠার বহুকাল আগেই কেউ কেউ আগ্রাসী ছিল
আর ভিখারি তৈরী হল পরে
মহামারি তারও অনেক পরে

তোর সুন্দর দেহে
অংশীদারী জীবনের ব্যবসায়ে বৃদ্ধ হল আজ সবাই
মানুষ এবং সকল গবাদিপশু

এখন এই শীতের মাসে
মহামারি আর গোয়াল ঘরের উপর
সমান তালে চাঁদ ঘোরপাক খায় কেবল ।

সময় ও রাত্রি – ২

বিমল বণিক

এই সময়
তার কালো শরীর জুড়ে
বিন্দু বিন্দু কুয়াশা জমে আলোকমালার মতো
এই সময় গভীর হয় দ্রুত
যদি সময়ের অন্য নাম নাম হয় রাত্রি

এখন ভীষণ শীত
এই রকম শীতের ভিতর দিয়ে সে পার হয়ে যায়

দৃশ্যতঃ অনেক কাছে
তথাপি আমি তার স্পর্শ পাই না

তার শরীরে বাস করে করে
জীবনের ভার বড় বেশী মনে হয়
সুতরাং, রাত্রি কিভাবে গভীর হল
কেবল বিস্ময় আর প্রশ্ন, প্রশ্ন আর বিস্ময়
এই সময় ।

HOME

গল্প

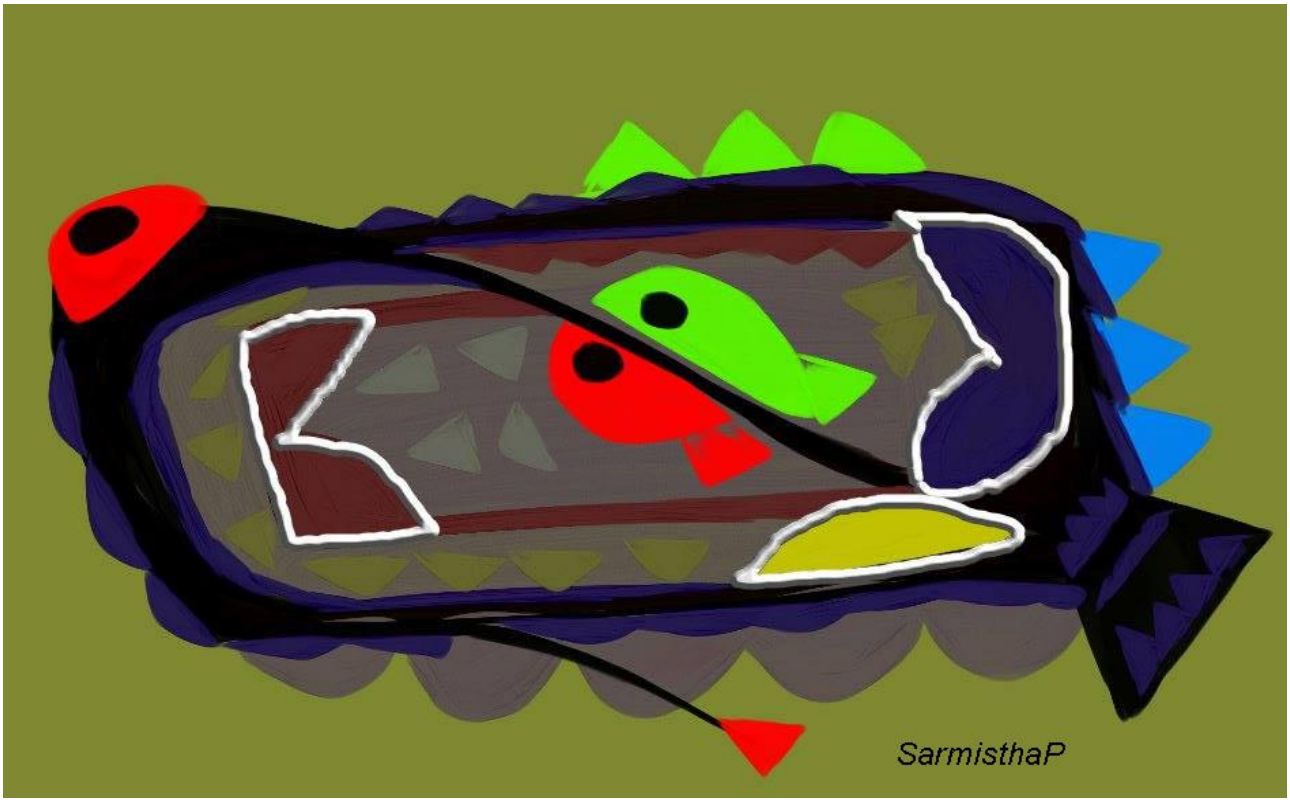

নির্মোসী

শ্যামল ভট্টাচার্য

আচ্ছা বাবা, নির্মোসী কি বিশল্যকরণী ? সেন্ট্রাল স্কুলের ক্লাশ থ্রি-র ছাত্রীর মুখে এই প্রশ্ন রঞ্জনকে চমকে দেয় । --- বিশল্যকরণী কী জানিস তুই ? ও মাথা নেড়ে গম্ভীর আওয়াজে বলে, মৃতসঞ্জীবনী, ঠাম্মা বলেছিল ।

রঞ্জনের খুব ভাল লাগে । টিয়ার মুখের গড়ন ওর ঠাম্মারই মতন । ঘুমিয়ে থাকলে মনে হয় মায়ের ছোটবেলা দেখছে বুঝি ! এখন ওর চেহেরায় ভোরের দীপ্তি । ট্যাক্সি-ট্র্যাক

রানওয়ের এই অংশটার দু'পাশে ঘন অরণ্য । দোতলা তিনতলা সমান উচ্চতার শাল, শিমূল, দেবদারু, আকাশছোঁয়া অশ্বত্থ আর মোটা ঝুরি নামানো বট । পাতায় পাতায় সবুজের রকমফের । আমলকি, আমড়া, কামরাঙা, বয়ড়া জাতীয় চেনা গাছ ও অসংখ্য গুল্মলতার ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণচূড়ার লাল, রাধাচূড়ার হলুদ কিংবা বেগুনী । নিম ও কাঁঠালগাছে ভিন্ন আকৃতির মৌচাক ফুল ও ফলের রসে টস্‌টসে । মধুময় ।

---ওই কালো কালোগুলি কি পাখির বাসা বাবা ? টিয়ার চোখের মণিতে বরফকুচি । বাসাগুলির দরজা কোথায় ? কোথা দিয়ে পাখিরা ঢোকে ? রঞ্জন তাকিয়ে দেখে একটি জংলীজিলেবি গাছে ঝুলছে নানা আকারের অসংখ্য কালচে রঙের পিঁপড়ের বাসা । ও বলে, চল কাছে গিয়ে দেখবি, ওগুলো পাখির বাসা নয় ! নুব্রা আঁতকে বলে, না না, জঙ্গলে যেতে হবে না । লাল, কালো, ছোট বড় সব পিঁপড়েরই বাসা রয়েছে দেখছি । ওর কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা শালিক একটানা কিছু বলে । পিঁপড়ের বাসা নিয়ে শালিকের আর্জিটা বোঝার চেষ্টা করে । শালিকের আর্জি ।

বিকেলের ডিউটি থাকলে সন্ধ্যায় এখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ফেরার সময় শালিকেরা এমনি অনেক কথা বলে । রঞ্জন ধীরে ধীরে প্যাডেল ঘোরায় । ঝিঁঝিঁর ডাক শোনে । ঝিঁঝিঁর ডাক ছোটবেলা থেকেই ভীষণ প্রিয় ওর । নানারকম ঝি ও ঝিঁঝিঁ ও তক্ষকের কক্কের সঙ্গে পিলে চমকে দিয়ে হুয়া হুয়া চিৎকারে শিয়ালেরা ডেকে ওঠে । কখনো ডাক থামিয়ে দলে দলে শিয়াল রাস্তা পেরোয় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে । রঞ্জন তখন জোরে প্যাডেল চাপে । কিছুক্ষণ জোরে চালিয়ে আবার ধীরে চালায় । আবার ঝিঁঝিঁর ডাক । আবার কক্কে, কক্কে । ছোটবেলা এই তক্ষকের ভয় দেখিয়ে, রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষকে কাটার গল্প শুনিয়ে ওকে ভাত খাওয়াতো মা । ঝিঁঝিঁর ডাককে বলতো, জুজুবুড়ির কান্না । জুজুবুড়ি কেন কাঁদে ! কিসের দুঃখ ? আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে মা বলতো, এখন ঘুমিয়ে পড়ো, বড় হলে বুঝবে তুমি জুজুবুড়ির দুঃখ । এ পথে সাইকেল চালাতে গিয়ে অনেক অনেক বছরের পরও রঞ্জনের মনে হয় সত্যি ঝিঁঝিঁর ডাক জুজুবুড়ির কান্না একই রকম ! প্রায় ন্যাড়া হয়ে যাওয়া পৃথিবীর জন্যে কাঁদে জুজুবুড়ি ।

জুজুবুড়ির আকর্ষণেই রঞ্জন বিকেলের ডিউটি সেরে এ পথে সাইকেল চালিয়ে ফেরে । জুজুবুড়ির আকর্ষণ ।

ভোরবেলার আওয়াজ একেবারেই অন্যরকম । অফিসার মেসে হেলথ ক্লাব হয়ে যাওয়ায়

আজকাল আর কেউ এদিকে জগিং-এর জন্য আসে না । এই নির্জনতায় এখন শালিক চড়ুই-এর কিচির মিচিরে মিশে যাচ্ছে কুব কুব কুবোর ডাক । দু'রকম ঘুঘুর ডাক; একটি সরু ও প্রলম্বিত, অন্যটি একটু মোটা ও আদুরে । তাছাড়া ভালুক-বক-সারস-হাঁসপাখি ও দোয়েলের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার ব্যস্ত কলকাকলি । সারি সারি চাকোলতা, ক্ষীরন্তি, কেঁদ, বয়জ, ছাতিম, কুসুম, চিকুম ভুয়াশ আরো কত নামের গাছের ফাঁক থেকে ডাকে পাখিরা ।

আরো কত শব্দ মিশে আছে এই আবহে ! কত বিচিত্র পাখি রয়েছে পৃথিবীতে । এ পথে যেতে যেতে অনেকবারই মনে হয়েছে সালিম আলি বা কোন পক্ষী বিশারদের বই কিনে পড়বে । ভাবতেই কোন্ সে অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস শরীর কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে ! রঞ্জন অবাক হয় ।স্মৃতি ওকে আনমনা করে দেয় । ভীষণ আনমনা । মোটা মোটা মওল, পিয়াশাল ও পলাশের সারি দেখে ওর মনে পড়ে পেরিয়ার । তামিলনাড়ু-কেরালা সীমান্তে ঘুমিয়ে থাকা জোড়া আগ্নেয়গিরির মুখে বিশাল সরোবর । অনেকটা বাংলা চারের মতন আকারের সরোবরে নানা জায়গায় জলের রং নানারকম । প্রতি মুহূর্তে সেখানে মেঘের রং, আকাশের রং পালটায় । যেদিকে চোখ যায় তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে । ঘাড় ঘোরালেই বুঝি কিছু না কিছু অদেখা থেকে যাবে ।

সেই সুন্দর দিনগুলি রঞ্জন ভুলতে পারবে না কোনদিন । নুব্রার সঙ্গে পরিচয় ঐ পেরিয়ার ঘুরতে গিয়েই । সরোবর ঘিরে সমাধিস্থ আগ্নেয়গিরির শীর্ষ থেকে পাদদেশ অব্দি ঘন অরণ্য আর অসংখ্য প্রজাতির পাখি । প্রথম পরিচয়েই কিছু অদ্ভূত রঙের আদানপ্রদানে ওদের বন্ধুত্ব দানা বাঁধে । তারপর একসঙ্গে পাখি দেখা, পাখি চেনা, ফুলের আদানপ্রদান, গল্প আর গল্প । সেখানেও ঝিঁঝিঁর ডাক । ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে রঞ্জন নুব্রাকে জুজুবুড়ির কান্নার কথা বলেছিল । জীবনে ঐ একবারই কাউকে ও জুজুবুড়ির কান্নার কথা বলেছে । কখনো আবার নৈঃশব্দ্য গল্পের চাইতে অনেক অনেক বেশী ভাবের পরিবাহী । এ যেন প্রতি মুহূর্তে ফুলপাতা, পাখি ও পালকে, রং ও কাকলিতে পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার । সালিম আলি নাকি ওখানেই বছরে ছয়মাস কাটাতেন । ওরা থাকে মাত্র পাঁচদিন ।

ফেরার সময় খারাপ লেগেছিল খুব । নুব্রারা আরো দু'দিন পরে ফিরবে । বাসস্ট্যাণ্ডে সেদিন ভীষণ অস্থির লাগছিল নুব্রাকে । সাদা সালোয়ার কামিজে বাদামি ওড়না ।

নীলগিরি ছুঁয়ে ছুটে আসা আরবসাগরের বাতাসে চুলগুলি উড়ে উড়ে মাঝেমধ্যেই কপাল ও চোখ ঢেকে দিচ্ছিল । বাস ছাড়লেও ওখানেই দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল নুব্রা । রঞ্জনের মনে পড়ে বাসের জানালায় দূরবীন চোখে লাগিয়ে ও তাকিয়ে ছিল থেক্কারি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প অব্দি --- যতক্ষণ দেখা যায় । তারপর কতদিন স্বপ্নে সেই বনানীর ঘ্রাণ পেয়ে জেগে উঠে এক অন্যতর বিষণ্নতায় ডুবে গেছে শেষরাতে । তখন থেকে ভোররাত অব্দি এক দমবন্ধ যাপন । আলো জ্বালালে বিলেটের অন্য সহকর্মীদের ঘুম ভেঙে যাবে । সেই বিশেষ ভোরগুলিতে দিনের আলো ফুটলেই নুব্রাকে চিঠি লিখতে বসতো । বিলেটের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে নিত সে ঘন্টাখানেকের জন্যে । ভোরের আকাশ রং বদলাত চিঠির কাগজে । রং বদলাত ।

--- একটা গন্ধ পাচ্ছো বাবা ? খুব সুন্দর গন্ধ !

টিয়ার প্রশ্নে চমকে বুক ভরে বাতাস নেয় ও । মনে হয় গন্ধটা পরিচিত । এক আশ্চর্য সুবাস সমস্ত চৈতন্যে ছড়িয়ে যায় । চনমনে হয়ে ওঠে রঞ্জন । ও আবার ঘ্রাণ নেয় । শরীরের কোষে কোষে এই সুবাস পৌঁছে দিয়ে ভাবতে থাকে, কোথায় যেন, কোন্ সে সুদূর অতীতে, অথবা জন্মান্তর থেকে ভেসে আসা এই ঘ্রাণ ! ভাবনার মাঝে বলে টিয়া, কিসের গন্ধ বাবা ওটা ? হালকা গোলাপি ফ্রকে সকালের আলো প্রতিসারিত হচ্ছে । ওর গালে ও চিবুকে এক অলৌকিক আভা । রঞ্জনের খুব ভালো লাগে । অরণ্য আর ট্যাক্সি-ট্র্যাকের মাঝে দু'হাতের মতন কাশফুলে সাদা । যেন ঘাসের ওপর তুষারপাত । কাশের শরীরে শরতের বাতাস ঢেউ খেলে । রঞ্জন চোখ বন্ধ করে আরেকবার ঘ্রাণ নিলে হঠাৎই স্মৃতির জানালা খুলে গিয়ে হুড়মুড় করে জেগে ওঠে সারি সারি রুক্ষ পর্বতমালা । ও চোখ বন্ধ রেখেই বলে, নি-র্মো-সী । নির্মোসীর মতন গন্ধ !

--- নিরমোসী কি বাবা ?

--- একরকম গাছ । পশ্চিম হিমালয়ের ঢালে পাথর ফুঁড়ে বেরোয় ! এর পাতা খাইয়ে দিলে মাতাল মানুষ বমি করে সুস্থ হয় । শিকড় বেটে খাওয়ালে মুমূর্ষু চাঙ্গা হয়ে ওঠে । একটি জলপাই গাছের নিচে রাখা অতি পুরনো বোমারু বিমানের ককপিটে কাকের বাসা । পুরো খোলটাই লতাগুল্মের ঘন আস্তরণে ঢাকা । অদ্ভুত লাগে । কেন জানি মনে হয়

যে কোন মুহূর্তেই বিমানটি গা ঝাঁকিয়ে উঠবে । অথচ রঞ্জন জানে এরকম কোন সম্ভাবনা নেই । নুব্রা বলে, ধ্যাৎ, পাথর ফুঁড়ে আবার গাছ বেরোয় নাকি ?

রঞ্জন মাথা নাড়ে । মুচকি হেসে নির্মোসী-প্রবাদের গল্প শুরু করে, রামচন্দ্র সাগর শুকিয়ে ফেলতে উদ্যত হলে সমুদ্রদেবতা ভয়ে হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চায় নিজের ও কোটি কোটি জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদের । বলে, আমার বরে যে কোন মনুষ্যেতর প্রাণী যদি জলে পাথরও ফেলে সেগুলি ভেসে ভেসে থাকবে !

রামচন্দ্র খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু আমি ধনুকে যে আগ্নেয়াস্ত্র লাগিয়েছি তা তো আর তূণীরে ফিরে যাবে না, ফিরিয়ে আনলেই বেসমেন্টটাই ব্লাস্ট হয়ে যাবে ।

সমুদ্র বলে, নো প্রবলেম, হিমালয়ে নিক্ষেপ করো । রঞ্জন ভেবেছিল এমনি করে বললে টিয়া মজা পাবে । কিন্তু ওর চোখে আতংক খেলা করে । মুখ থমথমে । নাকি ওর এমন মনে হচ্ছে । গতকাল রাতে একটা তথ্যচিত্রে সি.এন.এন.-এর তোলা খাড়িযুদ্ধের ক্ষেপনাস্ত্রগুলি কেমন রাতের আকাশ চিরে যাচ্ছিল সে দৃশ্য মনে পড়তে ও চুপ হয়ে যায় । দুই হাত কাঁধের দুপাশে সামনে পিছনে ঘোরায় । যতদূর চোখ যায় প্রশস্ত পথের দুপাশে কাশের বুকে বাতাস থেমে আছে । এসময় কাশ নীলচে সাদা । এরপর থেকেই মেঘ ও রোদে মানুষের মনের মতন বারবার রং বদলাতে থাকবে সকাল থেকে সন্ধ্যা । রঞ্জন টের পায় এ মুহূর্তে হাত ঘোরাতে আর ভালো লাগছে না । ও জোরে জোরে শ্বাস নেয় । আবার গন্ধটা পেতে চেষ্টা করে ।

নুব্রা জিজ্ঞেস করে, তো রামচন্দ্র তীর ছুড়লেন ? রঞ্জন গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়, হুঁ । না জানি কেন হঠাৎ মনটা বিষণ্ন লাগে । সেই তীরের বিষ পশ্চিম হিমালয়ের সমস্ত কোমলতা শুষে নেয় । মাটি হয়ে ওঠে নিরেট পাথর । বছরে নয়-দশমাস তো বরফেই ঢাকা থাকে । শুধু গ্রীষ্মের দুই-তিনমাস বরফ গলে গলে কঠিন পাথর খা খা ! প্রাণীকূল বাঁচার কোন উপায় না দেখে তপস্যা শুরু করে । তপস্যায় তপস্যায় হাড্ডিসর্বস্ব স্মৃতিসর্বস্ব ফসিল হয়ে পড়ে একেকজন । সবশেষে সবার সম্মিলিত ইচ্ছা ও শক্তি সেই পাথর ফাটিয়ে একটা গাছের জন্ম দেয়, --- নির্মোসী ।

নুব্রা বলে, যেমন সব দেবতার মিলিত আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত হয় দেবী দূর্গা ।

টিয়া হাততালি দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ মা, স্যাইম টু স্যাইম, দূর্গা আর নির্মোসী । তালির শব্দে পাশের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক সবুজ টিয়া ছোট্ট পুকুরটার দিকে উড়ে যায়

। পুকুরে পানকৌড়ি ও হাঁসেরা ভেসে বেড়ায় । গলা ডুবিয়ে জল খায় । পুকুরের কোণে কোণে গাছ ও বাঁশঝাড়ের ছায়ায় এখনো অন্ধকার । পানকৌড়ি হাঁসের আলোকিত মধ্যখানে ভেসে বেড়ায় ।

টিয়ার উচ্চারণ নকল করে নুব্রা বলে, স্যাইম টু স্যাইম, তুই খুশিতে একঝাঁক পাখি উড়ালি ।

ওদের শব্দের অভিঘাতে নাকি কোন এক ফড়িঙের পাখার ছোঁয়ায় লজ্জাবতী ঝোপে শতসহস্র পাতা মুখ লুকায় । ঘোমটার বাইরে টিকলির মতন জেগে থাকে বোতাম আকারের গোলাপি রোম রোম ফুলগুলি । নুব্রা বলে --- দেখো রঞ্জু, এই এয়ারবেসের বাইরে কোথাও সবুজ নেই । চারিদিকে লোকালয় আর কলকারখানা, বয়ে যাওয়া নদীটাও যেন পয়ঃপ্রণালী । অথচ দেখ কত প্রজাতির বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ফুল ও পাখি, এই মাটিতেই, এমনি এই পুরো অঞ্চলে ছিল, কত টাটকা বাতাস ..... ।

নুব্রার কথা শেষ হওয়ার আগেই চার্লি হ্যাঙ্গার থেকে জেট ইঞ্জিন অন করার বিকট শব্দ ওদের চমকে দেয় । রঞ্জন কবজি উলটে ঘড়ি দেখে । তারপরই দ্রুত হাঁটতে শুরু করে । তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে । ডিউটি রয়েছে । প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে এতক্ষণ বাস্তবকে ভুলে ছিল । কান ফাটানো শব্দে কংক্রিট কাঁপে । কোলাব্যাঙ, আঠাপোকা এবং শামুকেরা নিজেদের গতিপথ পালটে নেয় । গতিপথ বদলায় পিঁপড়েরাও । ওরা দ্রুত অরণ্যমুখী । খানিক এগোতেই টিয়া ওর টি-শার্ট খামচে ধরে কিছু বলে । ইঞ্জিনের শব্দে রঞ্জন বুঝতে পারেনা । টিয়া আঙুল তুলে ওর মাকে দেখায় । একটু পেছনে একটা হলুদ রঙের ধুতুরার মতন দেখতে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নুব্রার দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বিস্ময়ে হতবাক । নুব্রা চোখ বন্ধ করে ফুলটার ঘ্রাণ নিচ্ছে । টিয়া চেঁচিয়ে বলে, মায়ের হাতে নির্মোসী ফুল ।

রঞ্জন ভাবে, নির্মোসীর তো ফুল হয় না । ভোরের বাতাসে নুব্রার ওড়না যেন জয়ধ্বজা । থুতুনি ও গালে এক সবুজ আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে ! কী অপরূপা নুব্রা তুমি এখন ! ওর খুব ভাল লাগে । নুব্রা আরেকটা ফুল ওর হাতে তুলে দিয়ে বনদেবীর মতন মিষ্টি হেসে বলে, দেখো গন্ধটায় কত জাদু, অবাঞ্ছিত শব্দ থামিয়ে দেয় । রঞ্জন কিছুই শুনতে পায় না । বাতাস তোল্পাড় করে দিচ্ছে ইঞ্জিনের গর্জন । নুব্রার ইঙ্গিতে ওর হাতের কাছে নাক এগিয়ে ঘ্রাণ নেয় বুক ভরে । আঃ ।

অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি ! প্রবল সুবাস মস্তিষ্কের কোষে কোষান্তরে পৌঁছে কানের পর্দার কাছে রেণু রেণু জমা হয় । ভোজবাজির মতন ইঞ্জিনের শব্দ কানে আর ঢোকে না । অথচ কংক্রিট কাঁপতে থাকে । লজ্জাবতীর পাতারা এখনো মুখ লুকিয়ে । একটু আগের মতন কানে ঢোকে কলকাকলি । এই কলকাকলি আর্ত গোঙানির মতন, কান্নার মতন । শুধু ঝিঁঝিঁর নয়, এই সংকটে জুজুবুড়ি যেন সবার কণ্ঠে কাঁদছে । ব্যাঙ, আঠাপোকা, পিঁপড়ে ও শামুকেরা এখনো ত্রস্ত । শুধু কিছু নানা রঙের প্রজাপতি, মৌমাছি ও ফড়িং লজ্জাবতীর গায়ে গায়ে জড়ানো আরেক ধরনের শক্ত লতায় অনেক ক'টা ধুতুরার মতন দেখতে হলুদ ফুলগুলিতে বসছে ও উড়ছে । পাতাগুলি পানের মতন কিন্তু অগ্রভাগ সূচালো বর্শার মতন । সব ক'টি ফলা ট্যাক্সি-ট্র্যাকের দিকে তাক করা । এই চওড়া কংক্রিট ঢেকে দিয়ে সমস্ত অ-প্রাকৃতিক শব্দ থামিয়ে সবুজের সমারোহে পূর্ণতা আনতে ওরা উদ্‌গ্রীব । টিয়াও একটা ফুল শুঁকছে চোখ বন্ধ করে । বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিচ্ছে টিয়া । গোলাপি ফ্রক ফুলে ফুলে উঠছে বাতাসে ।

এখন রঞ্জন নিশ্চিত; এই ঘ্রাণ নির্মোসীর নয় । এই সময়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের মিলিত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ এই শরতের ফুল । টিয়া আঙুল তুলে দেখায় কাশের ফাঁকে দাঁড়িয়ে একটা সাদা খরগোশ তখন জ্বলজ্বল চোখে ওদেরকে দেখছে । টিয়ার চোখের মণিতে চিকচিক করছে কয়েককুচি বরফ ।

HOME

কবিতা

অহল্যা

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

তুলো বীজের মতো ছড়িয়ে পড়ছে
যে মৃদু হাওয়ায়, কানাকানি হলে
তার কথাও শোনা যায়। হিরণ্ময়
গর্ভ থেকে যে উঠে এসেছে, তার হাতে
গুঁজে দাও স্বপ্নের শোকগাথা।
অনন্ত নক্ষত্রের পথে হাঁটতে হাঁটতে
তোমার কাছ থেকে শুনে নেবো ইদিপস।

সে সিঁড়ি নেমে গেছে কৃষ্ণপক্ষের
দিকে, সে-দিকে প্রতিরোধের ছায়া
ফেলেছে মণিপুরের দ্রোহী রমণীরা

তুলোবীজের মতো ছড়িয়ে পড়ছে
চারিদিকে, হে প্রেম, হে দ্রোহ

লোকটাক জলের গভীর থেকে
উঠে আসছে সব মীনকেতন

চতুর্থীর চুম্বন

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

যদিও আমার সব জারিজুরি জেনেছে
প্রহেলিকাময় শীতল টিকটিকি, তবু
চতুর্থী তিথিতে চুম্বন শুধু চিবুকেই
মানায়, যে নেই কাছে তার কথাই শুধু
ভাবছি অবিরাম, যে দুগ্ধবতী, পৃথুল
হবার ভয়ে সে গেছে হার্বেল ম্যাসেজে,
ফ্যাশন টিভির সামনে বসে আছে এক
কবি, পোস্টমডার্ন, কালিদাসের মতো
শিবের সম্ভোগে পার্বতীর স্তনন
মহিমা সে শুধু করেছে ক্ষুণ্ন প্রতিরাত

কবিতা উইন্ডোজ খুললেই এমন
সুমিত গরিমার কথা জানা যায়

রি-সাইকেল বিন থেকে উঠে আসেন
কবি, কহেন তিনি, এই সব সমাচার
শোনো পুণ্যবান, অহো, অবোধ বালকেরা

HOME

কবিতা

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ

দিলীপ দাস

শব্দের সতীত্ব যাতে অক্ষুণ্ন থাকে
সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকবেন।

বিশিষ্ট পাঠকবৃন্দ এবং সমালোচক-অধ্যাপক-
কুসীদজীবী-কম্প্রাডর বুর্জোয়া-ঘাসকাটুরে-বৃহৎ
সাহিত্য প্রতিষ্ঠান-জাঙ্গিয়া ও ব্রার কারু-
শিল্পের কারিগর-মেলা কমিটির ঝানু
সেক্রেটারি-এফবিআই-এর এজেন্ট পত্রিকার রিভিয়ু লিখিয়ে-
এই মহাশয়েরা যাতে ক্ষুণ্ন না হয়েন, সেদিকে
সতর্ক থেকে গোল গোল, নিম্নাভিমুখী,
জঙ্ঘা-মুখর শব্দ নির্বাচন করে সাহিত্য
ইত্যাদি রচনা করবেন।

আপনার রাজনৈতিক মতামত সবসময় গেঞ্জির
ভিতরে গুহ্য রাখবেন – যতই তা ঘামে
ভিজে কটু গন্ধ ছড়াক, পরোয়া করবেন না।
শব্দ হবে জলের মতো নিরক্ষর ও
নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ কূর্ম অবতার—

শব্দ হবে কালিদাস বর্ণিত পার্বতীর
কুচযুগের মতো—সুগঠিত, সুডৌল এবং পেলব।
শব্দকে দিয়ে যা-তা বলাবেন না।
শব্দ হচ্ছে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। পাটের ফেঁশোর মতো
সাদা, নির্বিকার, নিরুত্তেজ তার দাড়ি, গায়ের
রং অগ্নিবর্ণ এবং তিনি আমৃত্যু পরমপিতা,
নিঝ্ঝুম শালগ্রাম শিলা।
রাজরাজড়াদের তোষণ করে আত্মতুষ্ট থাকেন,
ল্যাংটি পরাদের শব্দ কখনো পোষণ করে না।

হে মহান কবি, আপনি সেই শব্দের
পরিপোষক হোন, যে শব্দের ওষ্ঠে ও চিবুকে
সাপ এবং ব্যাঙের সশব্দ চুমোর দাগ
রক্তিম হয়ে জিগারের আঠার মতো লেপ্টে থাকে—
শব্দের গতি হবে এমন তীর্যক, যেন পাঠক
কিছুতেই বুঝতে না পারে আপনার
শব্দ-মহিমা। আপনি যখন হ্যাঁ, পাঠক
বুঝবেন— না। যখন না, পাঠক মনে
করবেন হ্যাঁ। যখন ডান, পাঠকের
মনে হবে আপনি নিঘ্ঘাত বামাবতার।

পাঠকের সঙ্গে এই চাতুরীটুকু
কবির জন্মলব্ধ কৃতিত্ব। এই চাতুরী থেকেই
পাঠক বুঝে নেবেন আপনি কোন
পাঠশালার ছাত্র। মনে রাখতে হবে,
আজকের পাঠক এবং পাঠিকা,
কবির কাছে চাতুর্য ও ছলাকলা
প্রত্যাশা করে। এটা কালিদাসের
যুগ নয়, কনজিওমারিজমের যুগ।
স্বভাবতই কবিও পাঠকের কাছে এবং
পাঠিকার কাছেও আশা করেন,
সেই নির্বীর্য ও নির্বস্তুক স্তুতি,
যে স্তুতির কাছে বিদূষকও হার মানবে।

HOME

কবিতা

মুহূর্ত

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

প্রতিটি খণ্ড মুহূর্ত জুড়ে তুমি তৈরি করো এক বিরাট মুহূর্তের
প্রতিটি খণ্ডকাব্য জুড়ে এক অনন্ত কবিতার মালা
আমি একটি মুহূর্তের রূপ দিতে গিয়ে
সৃষ্টি থেকে মরছি মাথা খুঁড়ে

অথৈ মায়ায় মগ্ন এই আশীর্ষপদ
কোনমতে ভাসিয়ে দেখলাম
আমার অসহায় দৃষ্টির দুনিয়া
কেমন দূর শূন্যে বিন্দু হ'য়ে যায়

অন্য এক শুরু থেকে

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

ঠিক কোথায় শুরু, খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেটাই
আমি শুরু খুঁজতে গিয়ে পৌঁছে গেছি আরম্ভের অনেক আগে
বোবা, বিহ্বল। পিছোতে গিয়েও অনেক হোঁচট
অনেক যুদ্ধের পর
আমি অন্য এক শুরু থেকে হাঁটছি
জোড়াতালির এই জীবনে ছন্দ ছেঁড়াখোঁড়া কত যে ধন্দ
বন্ধদুয়ার খুলে ভগ্ন-পদ্যে জ্বালছি আলো।

তোমার শ্রীমুখ অন্তত একবার তো ভাস্বর হবেই।

আজ

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

অপেক্ষায় আছি কখন কাগজ উপচে খৈ ফুটবে অক্ষরের
আমি কুড়িয়ে জমা করবো আর বাছাই শব্দে ফোটাবো তোমাকে
এদিকে সূর্যালোক পুড়িয়ে দিলো গারদের লোহা
জ্বালিয়ে দিলো মনপবনের নাও
খিড়কিতে আকাশ উপুড় হ'য়ে তুলে ধরলো বুকের অঙ্গার
অথচ এখনও মুখ ফুটে বলতে পারিনি আমার কথা

আমি পল্লব তুলে দেখলাম কতো আলোর জ্যামিতি কতো বিজ্ঞাপন
কতো সাজ কতো সজ্জা আমার অস্থিমজ্জায় ছিল। টানটান
আজ সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তোমাকে ফোটাবার দিন
সমস্ত অক্ষমতার দিকে ছোড়ার দিন তূণীরের যত তীর

প্রচার-মুগ্ধ

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

সবইতো বিজ্ঞাপনের গান, বান ডাকা এই ভুবনবিলাসী গল্প
ছড়ায় শেকড়, প্রচার শুনে প্রচার দেখে
বাজারমুখো পিলপিল ভিখারি সমাজ
বশীকরণের পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে হো হো ক্লাউন
এইতো এই নির্বাচনের ঋতু পতাকায় তোরণে বর্ণিল

বৃক্ষ তার ভুলে গেছে রং আকাশ দিয়েছে মুছে নীল
অসম্ভব শোর শুনে শুনে
তোমার তো ব্ল্যাকবক্স অবধি দৌড় হে মোল্লা হে সাধারণ
আজও তুমি সেই ভাঙা কুলো ভরা বুকে ভস্ম স্তূপাকার
কেউ কেউ ঘি ঢেলে যজ্ঞের স্বপ্ন দেখে আজও।

অখণ্ড

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

তুমি রাতকে খণ্ডন করতে চাওনা
চাওনা দিন খণ্ডিত হ'য়ে আসুক তোমার জীবনে
দিনের মধ্যে তুমি রাতকে গু'লে দিতে চাও
আর ডুবে থাকতে চাও এক ঘোলাটে সময়ের ভেতর

তাহলে বৃথাই কি আমার উজ্জ্বল দিন
বৃথাই কি ফোটা যামিনীর স্বপ্ন!

HOME

কবিতা

অবস্থান- এক

শর্মিষ্ঠা পাল

ডানে পাঁচ ঘর বামে পাঁচ ঘর পেছনে যত বেহিসাবি
ওপরেও নাকি মহাশূন্য সামনে অগুন্তি ভিড়
মানচিত্রে ছড়িয়ে আছে নীলসবুজ শ্যাওলার গালিচা
প্রতিটি খোপ সংরক্ষিত।

একপা থেকে আর এক পায়ের দূরত্ব মাঝে মাঝেই মাপতে যাই
ফিরে আসি আবার নিঃশব্দে শূন্যতার একটা বিশেষ ভূমিকা
আছে বৈকি! আপাদমস্তক ব্যবচ্ছেদে একরাশ দস্তাবেজ
জায়গা করে দেয় অবস্থান থেকে অবস্থানের ।

দীর্ঘায়িত ছায়া ঢাকা পড়ে আড়ালে আর একবার
ভারসাম্যের অভাবে ঘরগুলি তাকিয়ে থাকে
একটা শূন্যের খোঁজে কাটাকুটি ছাড়াই।

অবস্থান – দুই
শর্মিষ্ঠা পাল

আজ আমি বাতিল
কাল হয়তো তুমিও হবে
চোখ খোল, ছেড়ে দাও মূক বোঝা
সামনে লম্বা লাইন!

একটা নগণ্য বাতাস শরীরের শেষ প্রান্তে
অপেক্ষা করছে সবকিছু উড়িয়ে দেবার জন্য
ধোয়া মোছা নাহয় পরে হবে!

অবস্থান - তিন
শর্মিষ্ঠা পাল

প্রেমহীন খেলায় আমি বিশ্বাসী নই
এস যদি সাহস থাকে দুই একটা সংঘাত
অবাঞ্ছিত কিছু নয়।

বেঁচে গেলে নিশ্চয়ই মিটিয়ে দেব
উজাড় করে সব দেনাপাওনা

আগে দখল করো মানচিত্র।

HOME

কবিতা

ঘুমে জাগরণে

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

ভালো খবর আসবে ভেবে আটকে রেখেছি
শুধু অন্ধ নির্ভরতায়,
শেষ অবধি ধর্মঘট পেরিয়ে চিঠি আসবেই

কত বলেছি। আমি ঘুমিয়ে গেলে শব্দ করে
হাঁটো আমার ঘরে, আমি বাইরের হাবভাবে
আর পাঁচ জনের মতো, ভেতরে
ভেতরে আর্ত প্রস্রবণের শব্দের টং টাং,
যা পাওয়া বাকি তাই নিয়ে অবরোধ,
উৎসর্গ আর শেষ হতে চায় না

সাজিয়ে দিতে মাঝে মাঝে বেলা হয়ে যায়,
আমার যে অঢেল সময়, তাও,
জেগে আছো জেনেই চৌকাঠের ওপাশে
কিছু রেখে আসা মৃদু আয়োজন

যখন আসার সময় হবে আমি হয়ত
থাকবো না, আশ্বিন ছাড়িয়ে আমি
নদীর ওপারে চলে যাবো, নদীতীরে
দুঃখীদের ঘরবাড়ি, ব্রীজ পেরিয়ে
তখনও আঁধার নীরবতা,
আমি হঠাৎ জেগে উঠি, শীত লাগছে।
অনন্ত সময় একটা বোধ, যা শুধু কবিকে মানায়।

অন্তহীনের কথা ভেবে আজ রাত্রে নীচের দালানে
আমি নেমে যাবো, যে ভাবে প্রস্তুত থাকে
ফেরার সময় অচেতন প্রশ্নকাতরতা

জাগো হে কিন্নরগ্রন্থি, রাত হ'ল
পেছনে দীঘির জলে নীরবতা।

এতদিন পরে

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

যুদ্ধশেষ ভেবেছিলে তুলে নেবে রুপোলি পতাকা, স্থির বীজের
গর্ভে অন্ধকার রাত সীমানায়, ফসলের মাঠময় বিদ্যুতের তার
ছিঁড়ে পড়ে আছে; মসৃণ পাহাড়ি গ্রামে দৃষ্টিহীন নিজেও

অশ্রুত মেঘের দিকে হাত তোলে।

ভেবেছিলে যুদ্ধশেষ অতিকায় মূর্ছিত জানায় সব কিছু
আস্তে আস্তে ঢাকা পড়ে যায়, মানুষের মুক্তি এতো
সহজ নিষ্পাপ ধরে নেয়া কতো ভুল ও আপোষ
প্রতিপদে যাজকেরা উৎসবের মহিমা বুঝেছে;

এতোদিন বাদে স্বাধীনতা, মা এখন সদ্যোজাত শিশু
বুকে শধু পথ চেয়ে বসে আছে হাসপাতালে,
বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে কেউ আর আসেনা।

আর কেউ

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

রুপোর টাকা মাটির ভেতর লুকিয়ে রাখলে
কালো হয়ে যায়, ভেতরে হেঁটে বুঝেছি
কেউ বুঝতে চায় না।

নিশুতি আকাশের তলায় নির্জন ঘরে
আমি শুয়েছিলাম সারা রাত
একটা বিশাল গাছ থেকে ফোটা ফোটা
জল পড়েছিল সারা সময়,

কেউ আর গোলাপ হয়ে ফোটেনি।

HOME

কবিতা

বিজয়োৎসব

লক্ষ্মণ বণিক

তোমাকে জিতিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোন ফলের এষণা নেই আমার
তুমি যতো গড়ো কিংবা ভেঙে পড়ো, যেমন গড়ে ভাঙে শরতের
আকাশে পেঁজা তুলোর মতো স্তূপীকৃত মেঘ, বর্শাফলকের মতো
সূর্য বিচ্ছুরিত রং, দেখ্-দেখ্ করে এ-প্রান্ত, ও-প্রান্ত হুড়মুড়
ভাঙতে থাকে, কখনো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে
সমাপ্তিতে মানুষ ও রঙের খেলায়, যেন সবকিছু ছুঁয়ে থাকে
শিশুর সারল্য; এরপর এমন কোন শস্ত্র আমার হাতে
মজুদ থাকে না যার প্রয়োগে তুমি ধরাশায়ী অনেক দূরের,
বিব্রতও হবে।

জয়ীর হাত ছুঁয়ে থাকে ধবধবে নীল, পা অতি সুমসৃণ

মাটির বুক, হৃদয়ে প্রবহমান তাবৎ সহস্রাব্দের হাওয়া;
সেখান থেকে তুমি দৃষ্টি ফেলো আমার ওপর, আমি আর
যাই হোক সখ্যতার উষ্ণতাটুকু অটুট রাখার কলাকৌশল
কষ্টেসৃষ্টে রপ্ত করেছি, সেই বোধ প্রয়োগ করি শস্ত্রের বদলে
খুব বেশি আপ্লুত না হয়ে রোজ দুবেলা চা-বিস্কুট সহযোগে
প্রাতরাশ সারার মতো সেরে ফেলি তোমার অনাড়ম্বর আপ্যায়ন।

পদক অপ্রাপ্তিও বিস্বাদ ঠেকে না, যখন তোমার মুখে
খুশির ঝিলিক খেলা করে দেখি, দৃপ্ত চলাচল ছড়িয়ে পড়ে
প্রতি পদচারণায়, চোখের তারায় শিউলির হাসি, সেইখানে
আমি পুষ্পস্তবক রাখি, উদ্‌যাপিত হয় আমার অভ্যন্তরেও
বিজয়োৎসব।

এমন শিল্প

লক্ষ্মণ বণিক

দেখাশোনা যথেষ্ঠ হলো, এখন কেবল ঝোলায় তুলে নেয়া
অসংখ্য উপকরণ, নেবো বলেই না এতো চেষ্টাচরিত্র
চলন্ত রেলগাড়ির মতো ঝমঝম এসে পেরিয়ে যায়
খুঁটির মতো আমি দাঁড়িয়ে থাকি আর পছন্দমাফিক
পোষাকে জড়িয়ে দিই প্রতি মুহূর্তের অবয়ব

জড়িয়ে দেবার আগে খুলে নিতে হয়, এই বোধ
ভেতরে ডালপালা ছড়িয়ে গেলে সাবালকত্ব প্রাপ্তি
সেখানে আমি যথেষ্ট সতর্ক হই, সাবালকেরা
কার্যবিশেষে একটু স্বার্থপর হলে

বয়সের গুণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা বৃথা

সময় পালিয়ে যাবার আগে আমি ঝোলায় পুরি
পুব থেকে পশ্চিমে সূর্যের ঘোরাফেরা মনে দাগ কাটলেও
বছর পেরিয়ে এলে নতুন করে চমকে ওঠা স্বভাব,
চমকে উঠি, আর আশ্চর্যের হলো, বছর ঝোলায় তোলা থেকে
যতো বিরত হই ততো উঠে বসে মাথার দুই বিনুনী
চুলে লাল ফিতের ফুল কিশোরী মেয়ের মতো।

সময় নিতেই হয়, আমি দু'হাত ভরে ঝোলায় পুরি
মানসিকতা, মনকে শক্ত করে ধরে ঢুকিয়ে রাখি ঝোলার ভেতর
যেন জিওল মাছ লাফিয়ে না পালায়

ভালোবাসার জন্ম রয়েছে, ভালোবাসার মৃত্যুও সময়ের অপেক্ষা
দেখাশোনা ভালোবাসাকে স্থায়িত্ব দান করে, খুব কাছে থেকে
না দেখে কোনও কিছুর ভেতর প্রাণ আবিষ্কার বড়ো কঠিন।
প্রাণ ঝোলায় পোরার এষণা মনে রেখে মানুষ ধরি, মানুষ ছাড়ি
কেনোনা, নিঃস্বার্থ প্রাণদানের কৃৎকৌশল সবাই ভুলে গেছে,
এমন শিল্প এখন অচল

HOME

কবিতা

দৌড়

সিদ্ধার্থ নাথ

দৌড়তে পারি সটান।

তামাটে বিকেলে লাটিম পাক খায়,
হাত বাড়ালেই ছায়া আরও দীর্ঘ হয়
বৃত্তের ভেতর দোলন এপাশ ওপাশ।

তবু সিঁড়ি ভাঙি আশমান জমিন।

অতিক্রম

সিদ্ধার্থ নাথ

চেইন টানলেই থেমে যায়
বৃত্তান্ত সমাপ্ত হয়।
সীমান্ত অতিক্রম করে আততায়ী বুলেট।

অতিক্রম করি চাপ চাপ দাগ
অতিক্রম করি নিজেকে
ঠেকলেই যাই।
থ্যাঁতলে যায় কিছু প্রশ্ন ও প্রশ্নমালা।
লাটিম ঘুরপাক খায়
ধীরে ধীরে দাগ মিলিয়ে যায়
মিলিয়ে যায় সময় ও আমার ছোট্ট আকাশ।

পথ

সিদ্ধার্থ নাথ

পথ তুমি কত দূর বন্ধু হও
এক ক্রোশ
দুই ক্রোশ
তারপর সব লীন
আকাশ ও মাটি সুতো হয়ে যায়

ভরা বৃষ্টির শেষে
যতদূর চোখ যায় স্বপ্ন ও মায়া
মাঠের মায়ায় ঘেরা মানুষ
কত দূর আর হাত বাড়ানো যায়
হিম সন্ধ্যায় বসুন্ধরা তোমার বুকেই মুখ রাখি
ক্লান্তি ও ঘেন্নায়। HOME

কবিতা

জলকথা

প্রত্যুষ দেব

দুই হাতে জলের মমতা মেখে
আগুন ছুঁয়েছে যে মেয়ে
দহনের দশদিক সে কি চেনে ?
জানে সে কি মৃত্যুর জ্যামিতি
সে কি জানে রোদেরও বিষণ্ন মুহূর্ত থাকে
বৃষ্টিও আগুন-কথা ধরে রাখে বুকে
সে কি জানে এক কণা অশ্রু যদি প্রবাহে পতিত হয়
নদীরাও ক্রন্দনে তোলে ঢেউ

জানে সে কি, জানে সেই মেয়ে
জলও পোড়াতে জানে খরতাপে
জলও তলিয়ে দিতে জানে
প্রতিদিন অনিঃশেষ অন্ধকারে

সেই মেয়ে জেনেছে কি আজও
বারুদের ভ্রূণ যদি গর্ভে নেয় জলের বালিকা
নদীরাও একদিন প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে।

অন্য ক্যানভাস

প্রত্যুষ দেব

দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে কথা
ঘরময় তবু নীরবতা
তবূও নিঃসঙ্গ হাওয়া সকাতর ঠোঁটে
আত্মার নিবিড় পাঠে
কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফোটে

জানালায় নীল আলো ডেকে বলে, শোনো
সমস্ত আঁধার আজ উজ্জ্বল উৎসবে বদলানো

তবুও নৈঃশব্দ আছে, অন্ধকার আছে
জল, মাটি, নাভিমূলে আর ক্লান্ত প্রণয়ের ছাঁচে
লজ্জানত মধ্যরাতে আড়াআড়ি জেগে থাকে ক্রোধ
দরোজার খিল খুলে ঢুকে পড়ে আততায়ী রোদ

অলিগলি খোলা পথ বন্দরে ও মাঠে
পতঙ্গের মতো আজ আমাদের দগ্ধ দিন কাটে

তবুও মেঘের ছায়া ভীরু প্রেম স্নেহের আড়ালে
স্ফুলিঙ্গের কথা বলে তমসায় মুখোমুখি এখনও দাঁড়ালে। HOME

কবিতা

মেয়েটির জন্য

মাধব বণিক

শান্ত থাকো মেয়েটি।

শ্রাবণের অপ্রস্তুত বিকেলে ভিজে গেছে সারা শরীর

ভরা মাঠের শূন্যতায় থোকা থোকা দুরকি বন
নেচে নেচে গেয়ে যাচ্ছে অচেনা পবনগীত। আড়মোড়া ভেঙে
ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে আলে। বিজন দিগন্তে তখনও
বসে ছিল কেউ। সমাহিত, নির্বাক। সে শুধু
স্বপ্নের রং ছোঁয়ায়। কল্পলোকের রাজা-রানি-উজির সবাই নাচে,
মাঠ জুড়ে পৃথিবীর আনন্দপ্রভুরা

গলে গলে ঢেউয়ের সাথে মিশে যাচ্ছে।

মেয়েটি আরো ভিজবে, অবাকও হবে।
চোখ ভিজিয়ে স্বপ্নের প্রজাপতিরা রং ছড়াবে
শরীরের আনাচে-কানাচে, হৃদয়ের গভীরতম অন্তরালে।

এই মেয়ে, তুই যাস না।
এই নির্বাক মাঠে ঝিঁঝিঁদের কলতান
শুরু হবে এখন। দূর থেকে ভেসে আসবে
গাভীর ডাক, শেয়ালের লুকোচুরি। মেঘের আড়ালে
ঝুঁকে থাকবে সামান্য শিথিল তারাদের চোখ।

এই মেয়ে, তুই ঝুঁকে পড় পৃথিবীর কাছে।
সব মলিনতা মুছে মুন্ডাদের ঢাকের শব্দ
ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে বাতাসে। প্রিয়তোষ
সবাক হাসবে বুকে। যত ঋণ ছিল, যত অট্টহাসি
যত মুখচোরা কান্না – সব হারিয়ে যাবে।
নিঝুমের আবহগান শবের মুখেও
ছড়িয়ে দেবে দিগন্তের প্রশস্তি।

নিরবচ্ছিন্ন

মাধব বণিক

১

আকাশ-জল ছুঁয়ে কিছু ঘূর্ণাবর্ত
নিচের বারান্দায় জমে আছে কিছুদিন। পাখির

স্বপ্নে ডানার পরিক্রমার মতো ছেঁড়া কাঁথায়
ঘুমোয় বিষণ্ন বিড়াল। অনুষঙ্গহীন দূরান্তের চিঠিতে
লেখা হল সেকথা। যেকথার ওপারে
আজো নদী নিদ্রাহীন,
ধূ-ধূ বালুচরে হেসেখেলে তরমুজলতা।

এত মানুষের ভিড়ে নিঃসঙ্গ পতাকারা দোলে।
চোখের পাতায় তাদের রং, টিয়ার কম্পাঙ্কে শব্দলত্গুলো
ঘুওপাক খায়। ঝিমুনি শেষে ভিড়ের পাশে
কিছুই লেখা হয় না। এক চুলা আগুন নিয়ে বসে থাকি
বালুচরে, নদীর একান্তে। গাঢ় ঘাস ছুঁয়ে থাকে পিঠ।
ব্যাকুল জোনাকিরা মশাল বুকে আলোকিত করে গাছের ছায়া।
রাতের আড়ালে অসহায় ছুটতে থাকে দিনের দিকে।

২
শেষের কথা কেউ বলিনি আজো।
শুরুর কথাও সব বলা হয় না। স্কুলমাঠ
কাঁঠালতলা, সুভাষ স্যার হয়ে কখন যেন
হারিয়ে যাই নামহীন নদীটির বুকে। অজস্র
ফুটবল একসঙ্গে ধেয়ে আসে গোলে।

স্বপ্নের গোলকিপাররা খুব সাহসী হয় না।
কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে দোতলার বারান্দায়।

HOME

কবিতা

ভাস্কর

কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

পারছিল না। বইতে পারছিল না সে
এতটা দুঃখের ভার, তাই হাত বাড়াল।
সে হাত বাড়াল, অমনি আকাশ ঢাকল মেঘে
সে হাত বাড়াল, অমনি বাতাসে উঠল ঝড়
সমুদ্র মাতল তুফানে।
কিন্তু দুঃখের বোঝাটা যে সত্যিই আর বওয়া যায় না।
কোথায় রাখে সে তবে এ মহাভার?
ঘর উজাড় হল
গাছের পাতা খসল
পাখিরা ভুলল গান।
নিরুপায় সে বুকের পাঁজর ভেঙেচুরে
দুঃখভার ঢেলে দিল মাটির বুকে।
এবার? মাটি, তুমি কি দ্বিধা হবে ? নাকি

ভুলবে জীবন-গান ?

তখন দিনও নয়, রাত্রিও নয়
তখন শব্দও নয়, নিস্তব্ধও নয়
সে অবাক হয়ে দেখল, মাটিতে-ব্যথায় মাখামাখি
আর তারই পুঞ্জীভূত ব্যথারা মাটি মেখে
সঙ্গীত হয়ে ইঠেছে, ছবি হয়ে উঠেছে, প্রেম হয়ে উঠছে।

সেই থেকে সে দুঃখী মানুষটাকে সবাই বলে ভাস্কর
ভালোবাসার ভাস্কর।

এবার মলিনবস্ত্র ছাড়তে হবে

কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

টেলিফোনে যেন ফেলে আসা কোনো স্বর
একটু চমকে ওঠে সময়, আর
মুহূর্তে বদলায় ছবি।
পেছনের ঢেউ ছাপিয়ে যায়, ঢাক্কা মারে সামনের ঢেউকে
মনের গহীনে কোন্ নাছোড় অতীত
মান্না দে-র দরদী গান '...ছুপাউঁ ক্যায়সে...'
আসলে লুকোনো তো থাকে না কিছুই
আমরা মনে রাখি বা না রাখি, যতই যতনে সাজিয়ে
কুসুম রতনে ঢাকি, দিনের শেষে ক্লান্ত হাত
ঘষে চলে, ঘষেই চলে—
না জলে ভাসে, না আগুনে পোড়ে
এত দাগ মোছে না কোনও মন্ত্রেই – সখা হে, তবে
'এবার মলিনবস্ত্র ছাড়তে হবে...' HOME

কবিতা

পুকুর

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

সেই পুকুরটা। তার পাড় আছে জল নেই।
চারটে পাড় উঁচু করে বাঁধানো হয় প্রধানের করুণায়
সেইসাথে তাবৎ সম্পর্কের সুখগুলো পাড়ের তলায়
তাদের বিরল কান্না ভেসে ওঠে না ভূমির ওপরে

আত্মজকে বড়ো হওয়ার জন্যে দূরদেশে ছাড়া হয়
পাখিরা মায়েরা যেমন উড়াল শেখায় ছানাদের
কতটা দৌড়োলে, কতটা ঝুললে বড়ো হবে সন্তান
আকাশের নক্ষত্রেরা জানে না। জানে কমপ্লান।

ঝড়ো বাতাসের তাড়িত মোষের সঙ্গে

অবিরল বৃষ্টির মাখামাখি থাকলে
মনে হয় এবার পুকুর ভরে যাবে জলে
মীনশরীরে উথাল-পাতাল হবে আমার কমপ্লান বয়

আমার অন্ধকার খুপরিএ ভেতর শ্রাবণের জ্যোৎস্না
উঁকি দেয়। বুকের ওপর নক্‌শি কাঁথা তুলে দিয়ে
আমি তার ওম নিই। অনুভব করি মায়ের হাত
আসন্ন স্বপ্নেরা দল বাঁধে, ঢুকে যায় আমার ঘরে
আমি শুনি কিছু শব্দহীন দৈব-উচ্চারণ

আর এদিকে জলহীন পুকুরটা ভেসে যায় জলস্রোতে
কেন ডোবে পাড়, কেন ডোবে।

পাখি

আশোকানন্দ রায়বর্দ্ধন

শান্ত কুপির আলোয় জেগে ওঠে মায়াচিত্র—
এতসব কোঠাঘর। এতগুলো দরজা।
ঘরে জানলা নেই। দরজা হাট খোলা।
কোনও আই-হোলও নেই। কারেন্সি শাস্ত্রের
উদারকথা যে পাউচে ঢোকানো—
তার অর্ধেকটা হাওয়ায় ভরপুর।
হাওয়া শোবার ঘর থেকে হেশেঁল
শ্রমণহাসিতে আসে আর যায়।

অরণ্যমুণ্ডনের পর সূর্যাস্তের মানুষখেকো আঁধারে
এক লক্ষ্মীছাড়া পাখি মণিকোঠায় ঝাঁপ দেয়।
পাখিটা জন্মান্ধ। তবুও ওড়ে আকাশ-জমিন
পাখিটা বোবা। জাগরণী গায় নিদ্রাহীন
সর্বনাশা পাখি শেকলের দাস নয়। পলায়নপটু।

অফুরান স্যাঁতস্যাঁতে বিষাদ রেখে পাখি ফিরে গেলে
ভাবি, পাখির কী রং ছিল। কী রং ছিল পাখিটার
লাল হলুদ না নীল
হলুদ নীল না লাল
নীল লাল না হলুদ

HOME

কবিতা

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা

মুখ

আমাদের তিনখানা মুখ
দুইখানা ঘর একটি অসুখ
বন্দী ঘরে আলোছায়া
নিজের মতো খেলে
মাঝে মাঝে আয়নাতে মুখ
পরিপাটি বদলে যাওয়া
ভাল্লাগে না, জানলা খুলি
দেয়াল ঘেরা পাশের বাড়ি
বহুৎ দূর।

প্রতিবেশী

মাথার দু-পাশে চক্র
চিরল চিরল দুটি জিভ
আত্মস্থ, সম্পদ জড়িয়ে ফণা
ঘরের পাশে, আগলে রাখে ঘর।

দৃশ্য

মাছের আঁশের মতো ঢেউ।
সাঁকোর ওপর ছেলেটা রামধনু হয়ে
দাঁড়িয়ে। তার ছায়া ও স্বপ্ন
ভাসতে ভাসতে সাগরের নীলে মিশে যায়

ভাষা

তোমার ভাষা বদলে গেছে
নদীতে পড়ে আছে তারই ছায়া
মাটিতে পায়ের ছাপ
শব্দে মরুভূমির ছবি
খাতায় খাতায় পাখির পালক।

শীত

বাতাস এখন চাবুক মারছে বুকে

নবান্ন কি হারিয়ে গেছে
তাল পাটালি নলেনগুড়?
বলছিলে তো কেক-এর চেয়ে গোকুল পিঠে অনেক ভালো

শীতটা ভীষণ আগুন চায়।

ছবি

পাখা নেই তবু পাখি
ওড়ে অহংকার।

ব্যাকরণ

মুখ ঢাকে যার ব্যাকরণে
সন্ধি সমাস কারকে
কথার ভেতর যায় কি চেনা তাকে?
ধূর্তজনের সম্প্রদানে
সরল অঙ্ক ভুল
লিঙ্গ জানে স্ত্রী না পুরুষ
দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি
ণত্ব-স্বত্ব খাচ্ছে হাওয়া
বর্ণ বিপর্যয়।

HOME

নিবন্ধ

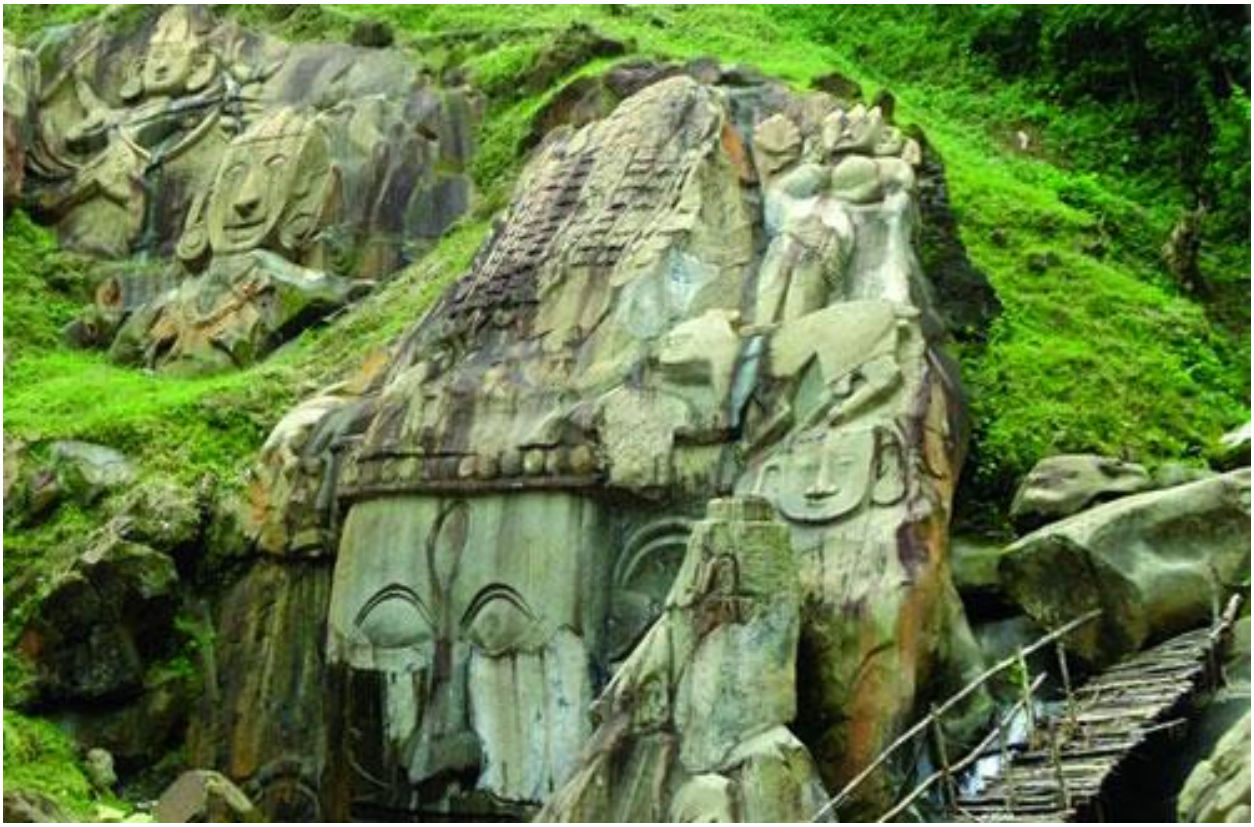

উনকোটিঃ পাহাড়িয়া ভাস্কর্য

সদানন্দ সিংহ

জায়গাটার নাম উনকোটি। উনকোটি মানে এক কোটি থেকে এক কম। এখানে পাহাড় কেটে কেটে অনেকগুলি মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল আনুমানিক অষ্টম-নবম শতাব্দীর মধ্যে। কেউ কেউ আবার বলেন এগুলি দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি। এখানে তৈরি করা মূর্তিগুলির জন্য এটা একটা শৈবিক পীঠস্থান বলে চিহ্নিত। বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তী যুগে সমগ্র ভারতবর্ষেই একসময় শৈবিক ধর্মের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। মনে হয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও তখন শৈবিক ধর্মের প্রভাবটা ছড়িয়ে পড়েছিল। মণিপুরি অরিবা ভাষার কাহিনিগুলির উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আরিবা হচ্ছে বর্তমান মণিপুরের মৈতেই ভাষার

পূর্বসূরী। এই আরিবা ভাষায় লেখা অনেক কাহিনিতেও আমরা শৈবিক ধ্যানধারণার প্রভাব দেখি। আসাম-উড়িষ্যা-বঙ্গে তো শৈবিক সম্প্রদায়ও তৈরি হয়েছিল। শৈবিক পীঠস্থান উনকোটি তখনকার সময়েরই ফসল।

উনকোটির অবস্থান আগরতলা থেকে ১৭৮ কিলোমিটার দূরে। কাছের বিমানবন্দর হচ্ছে আগরতলা। কাছের সুবিধাজনক রেলস্টেশান হচ্ছে ধর্মনগর। ধর্মনগর থেকে উনকোটির দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। আবার উনকোটি থেকে কৈলাশহর শহরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। কৈলাশহরের কাছের রেলস্টেশান কুমারঘাট। কিন্তু কুমারঘাটে সব ট্রেন থামে না।

পাহাড় কেটে কেটে তৈরি এখানের মূর্তিগুলি দেখার মতো। সংরক্ষণের অভাবে উনকোটির মূর্তির অনেকগুলিই ধ্বংসের মুখে। কোন কোন আর্কিওলজিস্ট আবার এ জায়গাটাকে বৌদ্ধধর্মের ধ্যানকেন্দ্র ছিল বলে উল্লেখ করেছেন, যেটাকে পরে শৈবিক পীঠস্থানে পরিণত করা হয়েছিল। এটা বাস্তব যে উনকোটি নিয়ে প্রকৃত গবেষণা এখনও ঠিক হয়ে উঠেনি। উনকোটি নিয়ে শিবের একটা মিথ এখানে চালু আছে। শিব সহ এক কোটি দেব-দেবী নিয়ে শিব বারাণসী যাবার সময় এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। রাত্রে শোবার সময় সবাইকে বলে দিয়েছিলেন খুব ভোরে ওঠার জন্যে। কিন্তু পরদিন শিব দেখলেন সবাই নিদ্রায় মগ্ন। শিবের রোষে উনকোটি দেব-দেবী পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

তবে স্থানীয় আদিবাসীদের বিশ্বাস যে কাল্লু কুমোর নামক এক ব্যক্তি, যিনি মনেপ্রাণে ছিলেন পার্বতী দেবীর উপাসক, একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পাহাড় কেটে এই মুর্তিগুলির তৈরি শুরু করেছিলেন।

প্রতি বছর এপ্রিল মাসে আশোকাষ্টমীতে এখানে উৎসব পালিত হয়। এছাড়াও জানুয়ারী মাসে এখানে একটা মেলা হয়।

বর্তমানে আর্কিওলজিকাল সারভে অব ইন্ডিয়া উনকোটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন। ভারত সরকার ইউনেসকো-র কাছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য আবেদন করেছেন।

HOME

নিবন্ধ

ত্রিপুরার লোককাহিনিঃ মৌখিক প্রত্নকথার বিশ্বজনীন রূপ

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

(দুই)

বিভিন্ন জনজাতি বা ট্রাইবদের মতো ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম মিথ প্রচলিত আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রাইমা ও শরমা নামে দুটি ক্ষীণতোয়া ছিল যা বর্তমানে ডুম্বুর জলাধারের গর্ভে চলে গেছে। এই দুটি ছড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে ত্রিপুরী জাতি লোকদের মধ্যে একটা মিথ প্রচলিত আছে। কাহিনিটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক অচাইর (ত্রিপুরী ওঝা বা পুরোহিত) দুটো মেয়ে ছিল। তারা ছিল মাতৃহীন। সে কারণে তাদের রোজই বাবার সঙ্গে জুম খেতে কাজ করতে হত। ত্রিপুরীরা জুমখেতে টঙ্গঘর তৈরি করে বাসা বেঁধে জুম পাহারা দেয়। তাদের কোন টংঘর না থাকায় তারা ঝড়বাদলে কষ্ট পেত। তাদের বাবাকে বারবার বলেও তারা নিরাশ হয়। একসময় বড়ো

বোন বনকুমারীর (বনদেবী) স্মরণাপন্ন হয়ে দেবীকে জানায় যে, যে তাদের জন্যে টংঘর তৈরি করবে, সে তাকে বিয়ে করবে। বনদেবী তার কথা শুনে একজন বনদেবতাকে পাঠালো। বনদেবতা রাতারাতি একটা টংঘর তৈরি করে দিয়ে একটা অজগর সাপের রূপ ধারণ করে টংঘরের মধ্যে বসে রইল। পরদিন সকালবেলা দু বোন জুমে এসে টংঘর দেখে খুশি হল। তারা টংঘরে ঢুকে একটা অজগর দেখতে পেল। বড়ো মেয়ে তার প্রতিজ্ঞামতো অজগরটিকে বিয়ে করল। কিন্তু তাদের বাপ অচাই বিষয়টিকে ভালভাবে নিল না। বড়ো মেয়ে যখন জুমে কাজ করতে গেল, তখন বাবা অজগরটিকে কেটে রান্না করল। মেয়েরা ফিরে এলে রান্না করা অজগরের মাংস খেতে দিল। বড়ো মেয়ে বুঝতে পারল ঘটনাটি। সে মনের দুঃখে যে পাহাড়ি ছড়াতে সাপের রক্ত ফেলা হয়েছিল সেখানে ঝাঁপ দেয়। দিদির শোকে কিছুদিনের মধ্যে ছোটো বোনও মারা যায়। বড়ো মেয়ে ছড়ার যে অংশে আত্মবিসর্জন করে, সেখান থেকে শরমা এবং ছোটো মেয়ের আত্মবিসর্জনের কেন্দ্রস্থল থেকে রাইমা ছড়ার উৎপত্তি। দু মেয়ে পরপর মারা যাওয়ায় এবং অনুশোচনায় তাদের বাবা অচাই পাহাড়ের উপর গিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে এবং অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। তাদের বাবাই হল ডুম্বূর জলপ্রপাত।

ত্রিপুরীদের ভূমিকম্প সম্বন্ধেও একটি প্রচলিত মিথ আছে। মাটির নিচে এক বিরাট কচ্ছপ গোটা পৃথিবীকে ধারণ করে রাখে। তারই আহার্য যোগাড় করে দেয় প্রতিদিন খেবুম বা গুবরেপোকা । পৃথিবীর উপরের বিভিন্ন প্রাণীর মল সংগ্রহ করে সে বয়ে নিয়ে যায় কচ্ছপটির জন্যে। একাজ করতে করতে তার মধ্যে আলসেমির ভাব আসে। সে একদিন কচ্ছপকে গিয়ে বলে যে, পৃথিবীর সব প্রাণী মরে গেছে। কাজেই তার আহার্য মল নেই। কচ্ছপের খেবুম-এর কথা বিশ্বাস হয় না। সে তার শরীরটাকে নাড়া দেয়। পৃথিবীটা কেঁপে ওঠে। কচ্ছপ আসল সত্য জানতে পারে। গুবরেপোকা তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলেই সে গা নাড়া দেয় এবং পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়।

ত্রিপুরীদের গৃহদেবতা নকছুমতাই-এর পূজার প্রচলন এবং ত্রিপুরা নামের উৎস বিষয়কও একটি মিথ প্রচলিত আছে। লোককথাটিতে দেখা যায় –

কুফুরতি নামে মাতুলালয়ে পালিতা এক কন্যা ছিল। যৌবন সমাগমে সে চন্দ্রদেবের সঙ্গে গোপন মিলনে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোক তার কথা বিশ্বাস করল না, তারা তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল। সেও গ্রামের বাইরে গিয়ে জুমের টংঘরে বাস করতে

লাগল এবং সেখানে একটি ব্যাং সন্তানের জন্ম দিল। কিন্তু কুফুরতি তার নাম রাখল চন্দ্রকুমার। বড় হলে চন্দ্রকুমারের সঙ্গে তার বাবা চন্দ্রকুমারের সঙ্গেভ সাক্ষাৎ হয়। সে কিভাবে মানুষ হতে পারবে তার সন্ধান জানতে চায়। চন্দ্রদেব জানান, যদি কোন মেয়ে তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে এবং ব্যাং-এর খোলসটি পুড়িয়ে ফেলে তাহলে সে মানুষ হতে পারবে। তখন চন্দ্রকুমার তার বাবার কাছ থেকে একটি ঘোড়া ও রাজপুত্রের পোশাক চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দূরদেশে এক রাজকন্যার সঙ্গে তার প্রণয়সূত্রে বিবাহ হয়। সে রাজকন্যাকে তার ব্যাং-এর পোশাক পুড়িয়ে ফেলতে বলে। রাজকন্যা পোশাকটি অর্থাৎ ব্যাং-এর খোলসটি পুড়িয়ে ফেলতে গেলে সেটি কথা বলে ওঠে, আমি তোমাদের 'নকছুমতাই'। তোমরা আমার পূজোর ব্যবস্থা করো। তোমাদের আর কোন অমঙ্গল হবেনা। এই বলে নকছুমতাই অন্তর্হিত হন। রাজকন্যা আবরণটি পুড়িয়ে ফেলায় চন্দ্রকুমার মানুষরূপ ধারণ করে। রাজকন্যা নকছুমতাই-এর পূজোর প্রচলন করে। নকছুমতাই-এর আশীর্বাদে চন্দ্রকুমারের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা তিনটি দেশ জয় করে রাজ্যপাট স্থাপন করে। রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুত্রা। সেই ত্রিপুত্রা থেকেই ত্রিপুরা নামের উদ্ভব।

মিথ-এর মধ্যে কোনও একটি জাতিসত্তার লোক ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি নিহিত থাকে। ফলে এক-একটি জাতির মিথ-এর মধ্যে তার স্বকীয়তা বিদ্যমান থাকে। লোককাহিনিতে মিথ তাই একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ। ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীরও এই জাতীয় প্রচুর মিথ চালু আছে।

এছাড়া ত্রিপুরী লোককথার নিজস্বতা প্রমাণের জন্য যে সমস্ত লোকজ অনুষঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়, সেগুলি লক্ষণীয়। এসব গল্পে আদিম মানুষের আগুন, কৃষির আবিষ্কার, সমাজ গঠন, শিশ্নের সৃষ্টি, ধর্মের উদ্ভব, ভাষা ব্যবহার শুরুর কথা, বিভিন্ন ধরণের খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। গবেষক সংগ্রাহক কুমুদ কুণ্ড চৌধুরী তাঁর সংগৃহীত লোককাহিনির (কেরেঙ কথমা --- অক্ষর প্রকাশনী, আগরতলা) প্রায় প্রতিটিতে ত্রিপুরার জুমভিত্তিক কৃষিজীবনের (বাতাস মামা, কলম্পাকন্যা, ভাইবোন হাতি হয়ে গেল, বাঘ ও শিয়ালের গল্প, নুয়াই রাজা, খুমবারতি, ছেলেরছা) চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া বনের বাঁশবেতের দ্রব্য তৈরির লোকশিল্পের নিদর্শনও আছে (খুমবারতি), বাঁশ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের (বিগ্রাছা) আছে, পশু শিকার জীবনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (সোনার পাখি), নদীতে বিষলতার জল মিশিয়ে দিয়ে (দক্ষিণ ত্রিপুরায় এ ধরণের পদ্ধতিকে

‘ম্যাল’ দেওয়া বলে, যা এখনও উপজাতিদের মধ্যে চালু আছে) বিষ জর্জরিত মৎস শিকারের (ছেলেরছা) ব্যতিক্রমী কৌশলের বর্ণনা ত্রিপুরী লোককথাগুলির নিজস্বতার দাবী রাখে। জুমে উৎপন্ন বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের মধ্যে তরমুজ, ফুটি, বাঙ্গি, জুমের তুলো, বিন্নি চাল, লাউ কুমড়া ইত্যাদি এবং খাদ্যাভাসের মধ্যে ভাত-মাংস, গোদক, বাঁশ করুল (বাঁশের অঙ্কুর), মদ্যপান ও তার সঙ্গে ‘চাখিনি’ (চাট)-এর ব্যবহার, পোশাক-আশাকের মধ্যে উপজাতীয় তাঁতে বোনা ‘রিছা’ (বক্ষবন্ধনী), ‘রিগনাই’ (উপজাতীয় মেয়েদের পরনের পাছড়া), ‘রিত্রাক’ (গায়ের বা বিছানার চাদর) এবং সেগুলিতে শিউলি ফুল, হাতির চোখ, মাছির ডানার লোক-নকশা তোলা ইত্যাদি একান্তই ত্রিপুরীদের নিজস্ব বিষয়। অসুখে-বিসুখে ও পূজা অনুষ্ঠানে মুরগি ডিম মদ্য ইত্যাদি দিয়ে ‘অচাই’-এর মাধ্যমে পূজো দেওয়া ইত্যাদি ত্রিপুরী জীবনী পদ্ধতির নিদর্শন। ডাইনি বা পরির অস্তিত্বে বিশ্বাস ইত্যাদি আদিবাসী সমাজের প্রাচীন জীননযাত্রার চিত্র লোককথাগুলোয় যত্র-তত্রই পাওয়া যায়। বাঘ, হাতি, অজগর, বানর, শেয়াল, কুমির পাখি, বিড়াল, মাছ, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণীর উপস্থিতি ও তার সঙ্গে আদিবাসী জনজীবনের একাত্মতা ইত্যাদির উদাহরণও যথেষ্ট আছে। ত্রিপুরী আদিবাসী সমাজের সহৃদয়তা, সরলতা, আতিথেয়তা ইত্যাদি মানবিক গুণেরও অবস্থান লোককথাগুলোতে লক্ষ করা যায়। সামাজিক দুর্বলতার সুযোগে রাজন্য শক্তির পরাক্রম ও ছলচাতুরির চিত্রও (খুমবারতি, ছেলেরছা) সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয়।

বাংলা রূপকথার যেমন প্রতিটি রূপকথা শেষ হলে ‘আমার কথাটি ফুরোলো/নটেগাছটি মুড়োলো’ নামের ছড়াটি আওড়ানো হত বলে কথিত আছে, তেমনি ত্রিপুরা লোককাহিনির কিছু সমাপ্তি-সূত্র আছে। সংগ্রাহক-গবেষক শ্রী কুন্ড চৌধুরী তাঁর সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন --- ‘প্রতিটি রূপকথা বলার শেষে ত্রিপুরী রূপকথার কথকরা দুটি কথা বলে থাকেন। এক, আওয়া তককে। এই কথার অর্থ সম্ভবত ‘এখানেই শেষ হল’। দ্বিতীয় কথা হল – দুখু থাও / সুখু ফাই / হা ছুছুক খুমপালি / নখা চুচুক মাইরুম ফাই’। কথাগুলোর প্রথম দুলাইনের অর্থ ‘দুঃখ যাক, সুখ আসুক। কিন্তু পরবর্তী লাইনগুলির অর্থ খুব পরিষ্কার নয় (কেরেঙ কথমা --- কুমুদ কুণ্ড চৌধুরী, অক্ষর প্রকাশনী আগরতলা) এক হিসেবে এই ছড়ার মধ্যেও একটা নিজস্বতা আছে।

কোন কোনও লোককাহিনি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ত্রিপুরী লোককথায় স্থান করে নিয়েছে। এখানে একটা বিষয় লক্ষ করা গেছে যে, যেসব গল্পে পশু-পাখির উপস্থিতি আছে, সে সকল গল্পের মধ্যে একটা নীতিকথা বিদ্যমান থাকে। পশুর মাধ্যমে লোকচরিত্রের উদঘাটন করা হয়। পশু বা পাখি কখনও কখনও অত্যাচারীর সাজা দিয়ে থাকে। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দানের করার মত মানবিক গুণসম্পন্ন হয়। এধরণের একটি ত্রিপুরী লোককথা হল ইঁদুর সর্দার। সর্দার ইঁদুর বিভিন্ন পতঙ্গ, সরীসৃপ এবং পক্ষীসমাজ থেকে উচ্চিংড়ে বউ, গিরগিটি বউ, ঘুঘু বউ ও দাঁড়কাক বউ নিয়ে সংসার করে। কিন্তু দাঁড়কাক বউয়ের সঙ্গে অন্যান্য সতীনদের বনিবনা না হওয়ায় ইঁদুর সর্দারের অশান্তি দেখা দিল। বউদের উভয় তরফ থেকে অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ চলতে লাগল। তার মনে হতে লাগল তার বউয়েরা তাকে ভালোবাসে না। সে পরীক্ষা করার জন্য বালিশের পাশে একটা বেতের ছড়ি রেখে মরার ভান করে পড়ে রইল। বউদের বড়ো, মেজ ও সেজ তাদের স্বামী মারা গেছে বলে পাশে কান্নাকাটি করতে লাগল। কিন্তু ইঁদুর সর্দার লক্ষ করল, ছোটো বউ আসছে না। সে মারা গেছে ভেবে কাকবউ এসে আনন্দে গান ধরল, গা, গারে, গাগারে গা / আগে ইঁদুরের মাথা খা। ইঁদুর সর্দার বুঝতে পেরেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাশের ছড়িটি দিয়ে এক আঘাতেই কাকবউকে শেষ করে ফেলল। কাহিনিটিতে 'যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ' এই সংস্কৃতি নীতিবাক্যটি আছে। সর্দারের বউয়েরা গোত্রান্তর হয়েও তাদের স্বভাব পাল্টায় নি।

ত্রিপুরী জাতির আর একটি সংগৃহীত 'নুয়াই রাজা' একটি বহুল প্রচারিত লোককাহিনি। কাহিনিটির বর্ণনার মধ্যে একটি পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার বেদনা লক্ষ করা যায়। অনেক উপজাতীয় রমণী এই কাহিনিটি একটি বিশেষ সুর করে শোকসংগীতের মত পরিবেশন করেন। এই গল্পে আছে, দুবোনের মধ্যে বড়ো বোন ছোটো বোনকে হিংসে করে। একদিন দোলনা খেলার ছলে বড়ো বোন ছোটো বোনকে জলে ফেলে দেয়। জলের ভেতর এক রাঘব বোয়াল ছোটো বোনকে খেয়ে ফেলে। বড়ো বোন বাড়িতে এসে মিথ্যে কথা বলে। তাদের মা ঘাটে কাপড় কাচতে গিয়ে বিষয়টি জানতে পারে। তখন বাড়ি থেকে স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাছের পেট থেকে ছোটো বোনকে বের করে। বাবা বড়ো মেয়ের শাস্তিস্বরূপ বিরাট খাঁচা বানিয়ে তাতে বড়ো মেয়েকে আটকে রাখে। তার প্রতি চলতে থাকে চরম অবহেলা। একদিন সে ছোটো বোনের কাছ থেকে বাঁশের ছিলা

নিয়ে তা দিয়ে খাঁচা থেকে মুক্ত হয়। বনে গিয়ে নুয়াই পাখির রাজার কাছ থেকে ডানা চেয়ে নেয়। বাড়িতে এসে সে ডানাগুলো সেলাই করে পিঠে বেঁধে নেয় এবং একসময় আকাশে উড়ে চলে যায়। মা অনেক কান্নাকাটি করে তাকে ফেরাতে চায়, কিন্তু পারে না। সে নুয়াই রাজার কাছে পৌঁছোলে নুয়াই রাজা তাকে বিয়ে করে। আবার নতুন বছরে মেয়ে তার বর নুয়াই রাজাকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে। রাত্রে সবাই ঘুমালে গলার লাল রঙের ঝুলিতে লুকিয়ে রাখা বিষধর ভীমরুল ছেড়ে দিয়ে মা-বাবাকে শাস্তি দেয়। এই লোককাহিনিটিতে খারাপ কাজের একটি যন্ত্রণাদায়ক দিক রয়েছে। আর নিজস্বতার প্রসঙ্গে সামগ্রিক কাহিনিটি ত্রিপুরার একটি প্রাকৃতিক বিষয় প্রাচীন লোক কথাকারের দৃষ্টি এড়ায়নি, তার নিদর্শন মেলে। এখানে শীতের শুরুতে যে পরিযায়ী পাখিরা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ত্রিপুরায় আসে, তাদের গলার লাল থলেটার কথা প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকতে পারে নুয়াই পাখির বর্ণনায়। প্রতি বৎসরই এসব পাখিরা এসে কিছুদিন স্থানীয় খাল-বিল জলায় বসবাসের পর আবার অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। সুন্দর দেখতে এই পাখিদের নিয়ে ত্রিপুরার লোককাহিনি, তার নিজস্ব সম্পদ। লোককথার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার পরিযায়ী ক্ষমতা। স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিচলনশীল মানব গোষ্ঠীর মতো লোককথাও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে, এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে পরিভ্রমণ করে থাকে। লোককাহিনির এই পরিক্রমণ কবে থেকে শুরু হয়েছে, তার কোন হিসেব-নিকেশ করা সম্ভব নয়। তবে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বইয়ের পাতায় ভর করে লোককথা স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোককথার চলাচলে কোন অসুবিধে হয় না। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ বেনফি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় কাহিনি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। তারপর ইতালি ও স্পেনের মাধ্যমে তা আরও বিস্তারলাভ করে। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসারের কথা মনে রাখলে দেখা যাবে, বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই ভারতীয় লোককাহিনি চিনদেশে বিস্তৃত হয়। বেনফির অন্য আরেকটি মত ছিল এই যে, বৌদ্ধদের মাধ্যমে তা প্রাচ্যে বিস্তৃত হয়। এভাবে একদিকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে পশ্চিমে এবং বৌদ্ধদের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনি তিব্বতে পৌঁছায়। আবার তিব্বত থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে মোঙ্গলদের দেশে। মোঙ্গলরা

যেহেতু দুশ বছর ইউরোপ শাসন করেছে সেহেতু বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনি পুনর্বার ইউরোপে প্রচলিত হয়েছে। (লোককাহিনির দিক দিগন্ত --- আবদুল হাফিজ)। ত্রিপুরা জাতি বৃহত্তর বোরো জাতির অংশ। আর বোরো জাতি হল মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সে কারণেই বেনফির উল্লিখিত সূত্র অনুসারে ত্রিপুরী লোককথার পরিব্রজনের একটা ইতিহাস আছে।

ত্রিপুরার লোককাহিনিগুলোর সঙ্গে অন্য কোনও সমান্তরাল লোককাহিনি ভারতের অন্য অঞ্চলে প্রচলিত আছে কিনা, সে বিষয়ে নিষ্ঠাবান গবেষকরা ইতিমধ্যে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। ত্রিপুরার বিশিষ্ট লোকগবেষক ডঃ রণজিৎ দে আটের দশকে লিখিত তাঁর প্রবন্ধে (দক্ষিণ ত্রিপুরা ও পুরুলিয়া জেলার লোককথার সাদৃশ্য) ত্রিপুরার একটি লোককথার সঙ্গে পুরুলিয়ার একটি লোককথার সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধে রাইমা-শর্মার উৎপত্তির মিথকেন্দ্রিক অজগর সাপের যে কাহিনিটি আছে, তার সঙ্গে সমান্তরাল আলোচনায় দেখিয়েছেন যে দুটি লোককথার মধ্যেই মেয়েরা চাষের কাজে যে অংশীদার হয়েছে এবং চাষের কাজ করতে গিয়ে অজগর সাপকে স্বামীত্বে বরণ করেছে। পারিপার্শ্বিক বর্ণনার মধ্যে দুটিতে উপজাতীয় উপাদান, বাঙালি লোককাহিনির উপাদান আলাদাভাবে বিদ্যমান। ত্রিপুরার লোকসমাজে প্রচলিত আরেকটি লোককাহিনিও সেরকম প্রায় হুবহু মালভি (মধ্যপ্রদেশের এবং রাজস্থানী হিন্দি আঞ্চলিক ভাষা) লোককথা --- বর্তমান প্রাবন্ধিকের নজরে এসেছে। ত্রিপুরী এই লোককথার নাম 'চেথুয়াং'। 'চেথুয়াং' অর্থাৎ ছাতিমগাছ-এর লোককথাটি এরকম --- গাইমং আর কুফুরতি দুজন ভাইবোন। একত্রে তারা জুমের কাজ করে। একদিন পাহাড়ি ছড়া পার হওয়ার সময় ভাইটি বোনের উরুর সৌন্দর্য অবলোকন করে তাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করে বসে। ভাই গাইমং-এর মা-বাবা , প্রতিবেশী সকলেই এই ধরণের বিবাহ হয়না বলে খুব বোঝাল। কিন্তু সে কুফুরতিকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করার হুমকি দিল। তখন মা-বাব বাধ্য হয়ে বোনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করল। একদিন তাদের ঠাকুমা ধান ঝাড়ার সময় বিয়ের কথাটা ফাঁস করে ফেলল এবং কুফুরতির কানে গেল। তখন কুফুরতি ছাতিমগাছ বা চেথুয়াং-এর কাছে গিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। ছাতিমগাছ তাকে তুলে নিল। ভাই গাইমুং-ও গেছে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। সে যত উপরে ওঠে, গাছও তত বড়ো হয়। একসময় কুফুরতি স্বর্গে চলে গেল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি এল। গাছটি সহ

গাইমুং মাটিতে পড়ল। মালভি লোককথার গল্পটি হুবহু একই রকম, শুধুমাত্র ভাইবোনেরা রাজপুত্র ও রাজকন্যা। 'সোনা ও রূপা' নামের এই গল্পটির উল্লিখিত গাছটি হল এই অঞ্চলে বহুল পরিমাণে প্রাপ্য চন্দনগাছ। শ্রদ্ধেয় কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর সংগৃহীত লোককথা সংকলনের প্রথম লোককাহিনি 'বাতাস মামা' তো আগাগোড়াই বাংলা লোককথা সুখু-দুখুর অনুরূপ। এই 'সুখু-দুখু' গল্পটি সম্বন্ধে ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তার উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক মনে করছি। বাংলা লোককথা 'সুখু-দুখু' নিয়ে জার্মান গবেষক র্যালফ ট্রোগার এবং আমেরিকান গবেষক ওয়ারেন রবার্টস পৃথকভাবে দুটি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে , ঐ একই টাইপের কাহিনি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অন্তত নয়শটি রূপান্তরে ছড়িয়ে আছে। বিশ্ববিখ্যাত 'সিন্ডারেলা' কাহিনির তো একহাজারেরও বেশি রূপান্তর খুঁজে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু মোটিফগত পার্থক্যের জন্যই 'সুখু-দুখু' এবং 'সিন্ডারেলা' দুটি আলাদা টাইপের বলে গণ্য করা হয়। নইলে অভ্যন্তরীণ আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করলে এই দুটি গল্পের মৌলিক প্রাণসত্তায় কোনও তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিকভাবে বহু দূর-দূরান্তের সংস্কৃতিতে একইরকম গল্প কেমন ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে হাজির হয়ে থাকে, তার কয়েকটি নমুনা যদি মিলিয়ে দেখা হয়, তাহলে এই বক্তব্যগুলির যথার্থ যাচাই করার সুবিধেই হবে। এখানে 'সুখু-দুখু'-র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এই ছকের একটি রূপকথা পাই নাইজিরিয়াতে 'মাতৃহীন কন্যা এক জাদুশক্তিসম্পন্ন কুকুরের (সুখু-দুখুতে এই চরিত্র এক দরিদ্র বৃদ্ধার) অনুগ্রহে ধনী এবং বিত্তবতী হয়ে ওঠায়, তার বিমাতা নিজের মেয়েকে পাঠালে, সে বেচারির কপালে জোটে যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বনা। 'সুখু-দুখু'-তে মাতৃহীনা দুখুর বিয়ে হয় রাজপুত্রের সঙ্গে; এখানে মাতৃহীনার বিয়ে হয় গোষ্ঠীসর্দারের সঙ্গে। বাংলা গল্পে সুখুকে গিলে ফেলে অজগর। নাইজিরিয়ার গল্পে দুর্বিনীতা এবং লোভী দ্বিতীয় মেয়েটি গোষ্ঠী থেকে নির্বাসিত হয় অর্থাৎ ভাবগত কাঠামোর দিক দিয়ে দুটি গল্পই এক; রূপগত ও কাঠামোতেও এক। পোল্যাণ্ডের লোককথায় দুই বৈমাত্রেয় বোন 'অ্যাগনিসিয়া-ম্যারিক্সিয়া'-র গল্পও ঠিক একই ছকে গাঁথা। (লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ --- ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত) আর ত্রিপুরী লোককাহিনিটিতে দেখি মাতৃহীনা জুমিয়া কন্যা এক অলৌকিক বৃদ্ধা 'বাতাস মামা'-র মায়ের অনুগ্রহে তার ভাগ্যের পরিবর্তন আনে। 'সুখু-দুখু'-র মতো ত্রিপুরী 'বাতাস মামা'

গল্পেও বিমাতা সতীন কন্যার ভাগ্য পরিবর্তনে ঈর্ষান্বিত হয়ে নিজের মেয়েকে পাঠায়। ত্রিপুরী গল্পে মাতৃহীনা কন্যা বিত্তবতী হয়। এছাড়া 'ঢেঁকি করে ঘোড়া প্রসব' লোককথাটিও একটি বাংলা লোকক'ল্কজনক২ থার কিঞ্চিৎ কথান্তরিত হয়ে প্রায় অনুরূপই। বিশ্লেষণ করলে ঢেঁকির সঙ্গে এই ধার করা ঘোড়াটা আত্মসাৎ করার বামুন বুদ্ধির প্রকাশ রয়েছে গল্পটিতে। প্রতারণার জন্য বামুনের অবাস্তব যুক্তির কারণে তাকে গ্রামবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হতে হয়। তেমনি 'সোনার পাখি' ত্রিপুরী গল্পটির শুরুতে একটা নিজস্বতা থাকলেও শেষপর্যন্ত লোককাহিনিটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংকলিত একটি রূপকথার সঙ্গে বেশ মিলে যায়। পূর্বে উল্লিখিত চন্দ্রকুমারের কাহিনিতেও ব্যাঙের খোলস বদলানোর মধ্যে বাংলা লোককথা 'বুদ্ধু-ভুতুম'-এর রাজকুমারে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। তেমনি 'কলম্পাকন্যা' ও 'ছেলেরছা' এই দুটি ত্রিপুরী লোককথাতেও রূপান্তর ব্যাপারটি আছে। এভাবে ত্রিপুরী লোককথার মধ্যে অন্যান্য লোককথার সমান্তরাল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সামঞ্জস্যের বিষয়টি এখনও বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। যথাযথ ও আন্তরিক বিশ্লেষণ হলে ত্রিপুরার লোককাহিনিও একটি সমৃদ্ধতর পরিমণ্ডলের যোগসূত্র পেয়ে যাবে।

(শেষাংশ আগামী সংখ্যায়)

HOME

অণুগল্প

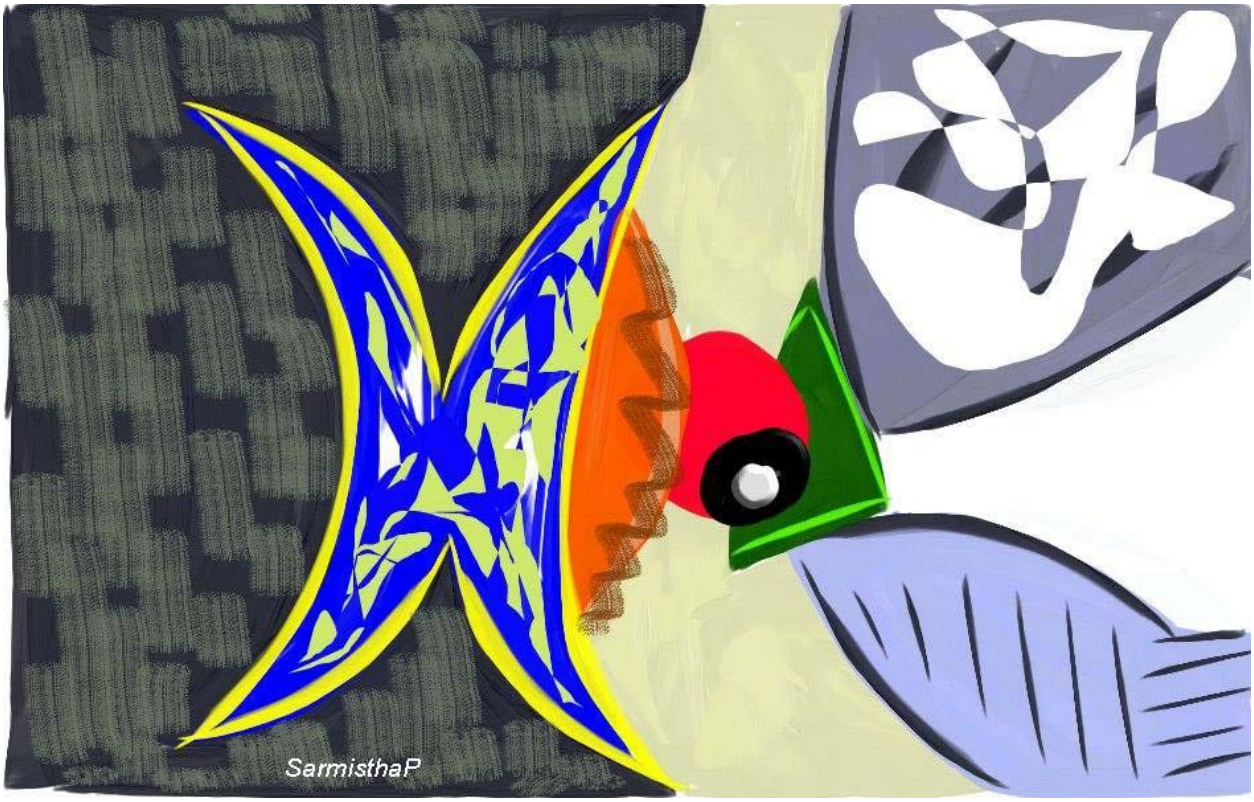

চেকিন উৎসব

ব্রতীন বসু

ছেলের স্কুলের হলিডে হোমওয়ার্কের প্রজেক্ট। উৎসব। প্রত্যেক উৎসবের পাঁচটা করে ছবি জমা দিতে হবে।

দুর্গাপুজো ঈদ জন্মাষ্টমী দিওয়ালি ক্রিস্টমাস।

আমি অফিস থেকে ফেরার পথে পাড়ার সাইবার কাফে থেকে সব করিয়ে নিয়ে ঢুকলাম।

--- বাবলু দেখ তো ছবিগুলো ঠিক আছে?

সবে জামা ছেড়ে চা এর কাপটা নিয়ে বসেছি।

বাবলু রেগে মেগে হাজির,

--- বাবা কি কর তুমি। ছবি প্রিন্ট নেবার আগে একটা ফোন করে জেনে নিতে পারতে তো। এখন কি করব। কাল স্কুল খুলবে জমা দিতে হবে।

--- কেন তোর বাবা ছবি করে আনেনি? কতদিন থেকে বলছি নিয়ে এসো নিয়ে এসো সেই শেষ অবধি অফিসের কাজের বাহানা দিয়ে ফেলে রাখলো। আমাকে এখন আবার সন্তোষী মার পুজোর সব জোগাড় করতে হবে। কে যাবে। রাত নটা বাজে।

আমি একবার ছেলের মুখের দিকে একবার ওর মার মুখের দিকে চাইলাম। আমতা আমতা করে জানতে চাইলাম, কি হল আবার, কেন এনেছি তো।

--- ধূর ম্যাম বলেছে ক্রিস্টাসের ছবিতে সান্তার ছবি না আনতে। ইলিয়ট ম্যাম বলেছে সান্তাক্লস মিথ্যে। তোমাদের পেরেন্টসরা সান্তা সেজে উপহার দেয়। সব উৎসবের সত্যি ছবি আনতে হবে।

আমি আবার জামা গলালাম। সত্যি ছবি আনতে হবে।

তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দোকানটা না বন্ধ হয়ে যায়।

ইশ্। সন্তোষীমার পুজো না থাকলে আমাকে আর বেরতে হত না।

গলির মোড়ে গিয়ে খেয়াল হল মোবাইলটা ফেলে এসেছি। বাকি কি কি সত্যি জানা হল না তো বাবলুর কাছে।

তারপর নিজের মনেই একটা দৃশ্য ভেবে ফিক করে হেসে ফেললাম।

বিশ্বাস দেশ থেকে প্লেনটা ল্যান্ড করেছে। এয়ার রিলিজিওন। বাস্তব জগতের টার্মিনাল।

একে একে ঢূকছেন দুর্গা, গণেশ, হজরত মহম্মদ, সন্তোষীমা, ক্রাইস্ট, কৃষ্ণ।

গেটে ইলিয়ট ম্যাম। চেকিন চলছে।

মে আই সি উওর পাসপোর্ট প্লিজ।

HOME

কবিতা

রেশ

সদানন্দ সিংহ

বর্মধারী এক পুরুষ হেঁটে গেলেন আমাদের বহু আগে আগে
লিখে গেলেন দেয়ালে দেয়ালে, ভারত এক মহান দেশ।
তারপর গাইলেন গান, সারে জঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা ...

হাততালি পড়লো প্রচুর, ছোঁড়া হল তোড়া তোড়া ফুল

সে হাততালির রেশ ছড়িয়ে পড়লো
সমতল থেকে পাহাড়ে, পাহাড় থেকে সমতলে
আসমুদ্র হিমাচলে

তারপর একদিন
সেই ফুল থেকে বৃষ্টি এলো,
তার সাথে বুলেট এলো, বোমা এলো, ঝড় এলো, নৌকা এলো,
খরা এলো, বন্যা এলো, আরো কত কিছুই যে এলো

বর্মে তো ক্ষতি হয় না, লুটায় অসহায়রা

খুন জখম হত্যার খবরে ক্রমশ অভ্যস্ত শহুরে মানুষ
আড্ডায় গলা ফাটায়, পরস্ত্রী নিয়ে রসালো আলাপ জমায়

গরীবেরই ঘর পোড়ে, রোগে-শোকে জীর্ণ হয়, অনাহার বাড়ে

ঋষিপুত্র

সদানন্দ সিংহ

সে ছিল এক ঋষিপুত্র, রক্তে আর্য-অনার্য
আর ধর্মে এক মহা চণ্ডাল
সর্বদা সারমেয় প্রবৃত্তির বশবর্তী এবং এক কুপুত্রের জন্মদাতা।

শুধু দাবানলের মাঝে সে খুঁজে পেত ঝলসানো খরগোশ
দিবারাত্রির মাঝে সে খোঁজে নি কোনদিন কোন যৌক্তিকতা

তবু লেলিহান আগ্রাসনে সব কিছু ধ্বংস হয়
ধীরে ধীরে, অজান্তে
হাত-পা কালো হয়, মুখ কালো হয়; দৃষ্টি অপ্রখর

উদ্দীপনা থেকে নেমে আসে একদিন মন্দার স্থবিরতা

তারপর
পিতৃব্য পরিহাসে আজ তার বুক জ্বলে
অধরা থাকে ইতিহাস ----- একবুক আজন্ম

HOME